Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ্

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন

রোলঃ ২১৫০০২৪৪

৬ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ্

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আফরিন

রোলঃ ২১৫০০২৪৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সীরাহ্" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আফরিন, আইডিঃ ২১৫০০২৪৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সীরাহ্" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sadia Afrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সাদিয়া আফরিন

আইডিঃ ২১৫০০২৪৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
প্রারম্ভিকা	৭
সৌভাগ্যময় জন্ম ও পবিত্র জীবনের ৪০ বছর	৮
বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন	৯
বক্ষ বিদারণের ঘটনা	১৩
স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে	১৪
পিতামহের স্নেহ ছায়ার আশ্রয়	১৪
স্নেহশীল চাচার তত্ত্বাবধানে	১৫
বাহিরা রাহেব	১৬
ফিজার যুদ্ধ	১৭
হিলফুল ফুযূল বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা	১৮
দুঃখময় জীবনযাপন	১৯
খাদীজাহ (রা) এর সঙ্গে বিবাহ	২০
কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসা	২২
নবুয়াত লাভের পূর্ববর্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত চরিত্র	২৪
পয়গম্বরী যুগ - দাওয়াতের সময়কাল	২৬
হেরা গুহার অভ্যন্তরে	২৬
জিবরাঈল (আ) এর আগমন	২৬
ওহী বন্ধ	২৯
পুনরায় ওহী সহ জিবরাঈল (আ) এর আগমন	৩০
তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার	৩১
ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল	৩২
প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ	৩৪
আত্মীয় স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ	৩৫
সাফা পর্বতের উপর	৩৬
হজ্জযাত্রীদেরকে বাঁধা দেয়ার বৈঠক	৩৮
রাসূলুল্লাহ (সা) এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান	৩৯
আবু ত্বালিবের নিকট কুরাইশদের প্রতিনিধি দল	৪০

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
পুনরায় আবু ত্বালিবের নিকট কুরাইশদের প্রতিনিধি দল	৪১
রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে বিভিন্নমুখী শত্রুতা	৪৩
আরকামের বাড়িতে	৪৫
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত	৪৫
মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	৪৬
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত	৪৮
অত্যাচারে কঠোরতা এবং নবী কারীম (সা) কে হত্যার ষড়যন্ত্র	৪৯
হামযাহ (রা) এর ইসলাম গ্রহণ	৫৩
উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ	৫৬
রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ	৫৭
রাসূল (সা) কে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহলের অস্বীকার	৬৩
আবু ত্বালিব ও তার আত্মীয় স্বজনদের অবস্থান	৬৫
অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গিকার	৬৭
তিন বছর শিয়াবে আবূ ত্বালিবের বয়কটরত অবস্থা	৬৮
অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট	৬৯
আবু ত্বালিবের নিকট পাঠানো কুরাইশদের শেষ প্রতিনিধি দল	৭২
আবু ত্বালিবের মৃত্যু	৭৫
অনন্তকালের রহমতের পথে খাদিজাহ (রা)	৭৬
দুঃখের উপর দুঃখ	৭৭
রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সাওদাহ (রা) এর বিবাহ	৭৮
ত্বায়িফে রাসূলুল্লাহ (সা)	৭৯
ঊর্ধ্বগমন বা মি'রাজ	৮২
আক্বাবাহর প্রথম বায়আত	৮৬
মদিনায় ইসলাম প্রচারকের দল	৮৭
আক্বাবাহর দ্বিতীয় শপথ	৮৭
কুরাইশদের উপর আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি	৯০
হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী	৯০
দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের অধিবেশন	৯১
রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাড়ি ঘেরাও	৯৩

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর গৃহত্যাগ	৯৪
কুরাইশদের প্রচেষ্টা	৯৮
মদিনার পথে	৯৯
কুবাতে আগমন	১০০
মদিনায় প্রবেশ	১০২
মদিনার প্রথম পর্যায়	১০৪
মুসলিমদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা	১০৯
মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান	১১০
যুদ্ধের অনুমতি	১১১
বদর যুদ্ধের পূর্বের সারিয়্যাহ ও গাযওয়া সমূহ	১১২
গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা - ইসলামের প্রথম ফয়সালাকারী যুদ্ধ	১১৪
উহুদের যুদ্ধ	১২০
খন্দকের যুদ্ধ	১২৪
উহুদ ও আহযাব মধ্যবর্তী সারিয়্যাহ ও যুদ্ধসমূহ	১২৫
রা'যীর ঘটনা	১২৫
বীরে মাউনাহ এর মর্মান্তিক ঘটনা	১২৯
হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি	১৩২
খায়বারের যুদ্ধ	১৩৩
কাযা উমরাহ	১৩৬
মুতাহর যুদ্ধ	১৩৯
মক্কা বিজয়	১৪১
হুনাইনের যুদ্ধ	১৪৪
তাবুক যুদ্ধ	১৪৬
বিদায় হজ্জ	১৫০
সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান	১৫৭
শেষকথা	১৬৯
তথ্যসূত্র	১৭০

প্রারম্ভিকা

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে চিনলেও তাঁকে আমরা জানিনা । জানিনা বলেই তিনি কারো কাছে নিছক একজন ' ভালো মানুষ ' , আর দশজন মনীষির মতো , যারা কিনা কিছু দার্শনিক তত্ত্ব আর নীতিকথা বলে খালাস! কিংবা কারো কাছে তিনি একজন ' ধর্মপ্রচারক ' , কিছু ভালো ভালো কাজ করেছেন , এই যা ! কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন রাসূল। আল্লাহ এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিকে পাঠিয়েছেন আমাদের জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পথ দেখানোর জন্য। এই পথচলার অনুপ্রেরণা পেতে আমাদের দরকার রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবন সম্পর্কে জানা। আর জানার জন্যই তাঁর সীরাহ পড়া।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাহ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ব্যক্তি জীবন, তাঁর নেতৃত্ব এবং তাঁর চারপাশের মানুষগুলো নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনীপ্রবাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাহ জানলে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সংকীর্ণ ধারণার দেয়ালগুলো ভেঙে যাবে। জানা যাবে রাসূলুল্লাহ (সা) কত চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কারো মন জয় করতেন , কাউকে রুখে দিতেন , আর কাউকে মোকাবিলা করতেন। নিজের ঘর থেকে শুরু করে যুদ্ধের ময়দান – প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব । যারা তাঁকে ভালোবেসেছে , তাদের জীবন আমূল বদলে গেছে , যে জাতি তাঁর অনুসরণ করেছে , তাদের ভাগ্য বদলে গেছে। যে বিপ্লবের সূচনা রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, সেটা চলবে ততদিন, যতদিন না মুসলিম জাতি সমগ্র পৃথিবীর উপর বিজয়ী হবে ।

পবিত্র কুরআনে কারীমে সীরাহ্ শব্দটি শুধুমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ত্বহার ওই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি তাকে ধরো এবং ভয় পেয়ো না। আমি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব, যেরূপ প্রথমে এটি ছিল। '

এখানে সীরাহ্ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মোটকথা, সীরাতের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো ভালো মানুষের বা নেককার মানুষের চাল-চলন, ওঠাবসা, কাজ, মেজাজ-মর্জি। এককথায় জীবন পদ্ধতি বা জীবন চরিত।

সীরাহ্

(পবিত্রতম জীবনের আদ্যোপান্ত)

সৌভাগ্যময় জন্ম ও পবিত্র জীবনের ৪০ বছর

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার সুবহে সাদিকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজী পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল।

ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মা বলেছেন যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিল।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই আমিনাহ আব্দুল মুত্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শোনা মাত্রই তিনি আনন্দ চিত্তে ঘরে প্রবেশ করে নবজাতককে কোলে তুলে নিয়ে কা'বাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত এ শিশুর মুখমন্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্তই আনন্দ মধুর এ মুহূর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে এ নবজাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মাদ। আরববাসীগণের নামের তালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়।

তাঁর মাতার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবূ লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। ঐ সময় তার কোলে যে সন্তান ছিল তাঁর নাম ছিল মাসরুহ। নাবী কারীম (সাঃ)-এর পূর্বে সুওয়ায়বা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকে এবং পরে আবূ সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমীকেও দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।

বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে তৎকালীন আরবগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথাটি ছিল শহর-নগরের জনাকীর্ণ পরিবেশ জনিত কুপ্রভাব থেকে দূরে উন্মুক্ত গ্রামীন পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করার মাধ্যমে তারা যাতে বলিষ্ঠদেহ এবং মজবুত মাংসপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে সক্ষম হয় সেজন্য দুগ্ধ পানের জন্য বেদুঈন পরিবারের ধাত্রীগণের হাতে শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রথা অনুযায়ী অব্দুল মুত্তালিব শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালীমাহ বিনতে আবূ যুয়ায়বের নিকট তাকে সমর্পণ করেন। এ মহিলা বনু সা'দ বিন বাকর গোত্রের একজন ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল হারিস বিন আব্দুল উযযা এবং উপনাম ছিল আবূ কাবশাহ। তিনিও বনু সা'দ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

হালীমাহ ও হারিস দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মান লাভ করে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ আব্দুল্লাহ, আনীসাহ, হুযাফা অথবা জুযামাহ। হুযাফা শায়মা নামে অধিকতর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ শায়মাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা হালীমাহ সাহায্য করতেন বলে কথিত আছে। অধিকন্তু, তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সাফিয়্যাহহন বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবও হালীমাহর সূত্র ধরে দুগ্ধ সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। নবী কারীম (সাঃ)'র চাচা হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবকেও বনু সা'দ গোত্রের এক মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। হালীমাহ গৃহে থাকা অবস্থায় এ মহিলাও একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (সাঃ) এবং হামযাহ (রাঃ) দুধভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যান। প্রথম সূত্রে সুওয়াইবার সম্পর্কের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় সূত্রে বনু সা'দ গোত্রে সেই মহিলার মাধ্যমে।

দুগ্ধ পান কালে হালীমাহ নাবী কারীম (সাঃ)-এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে যান। হালীমাহর বর্ণনা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, হালীমাহ এবং তার স্বামী তাদের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ

বনু সা’দ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। সেই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষজনিত দারুন খাদ্য ও অর্থ সংকট বিরাজমান ছিল।

হালীমাহ বলেন, ‘আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিল। কিন্তু কি আল্লাহর মহিমা যে, উটের ওলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বাহির হচ্ছিলনা। আমার বুকেও শিশুটির জন্য এক বিন্দু দুধ ছিলনা। এ দিকে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি এতই ছটফট করছিল যে, সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারি নি। এমতাবস্থায় আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা-ভরসা নিয়ে প্রহর গুণছিলাম। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন উন্নতি না হওয়ায় অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় আমরা পথ চলা শুরু করলাম।’

‘আমি আমার মাদী গাধাটির উপর সওয়ার হয়ে পথ চলতে থাকলাম। গাধাটি ছিল খুবই দুর্বল, তার দুর্বলতা এবং শক্তি হীনতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে চলতে থাকল যে, এতে কাফেলার অন্যেরা অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করতে থাকল। যা হোক, এমনভাবে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যদিয়ে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলে এমন কোন মহিলা ছিল না যার নিকট শিশু নাবী (সাঃ)-কে দুগ্ধ পান করানোর প্রস্তাব দেয়া হয় নি। কিন্তু যখনই তারা জানতে পারল যে, শিশুটি পিতৃহীন ইয়াতীম তখনই তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কারণ, দুগ্ধদানের জন্য দুগ্ধপোষ্যের পিতার নিকট থেকে উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা সকলেরই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। মা বিধবা, দাদা বৃদ্ধ, এ শিশুকে লালন-পালন করে তার বিনিময়ে কীইবা এমন পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? ইতস্তত করে এ সব কিছু ভেবে চিন্তে দলের কেউই তা নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না।’

‘এদিকে দলের অন্যান্য মহিলা যারা আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সকলেই একটি করে শিশু সংগ্রহ করে নিল। অবশিষ্ট রইলাম শুধু আমি। আমার পক্ষে কোন শিশু সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। ফিরে যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল আমার মনটা

ক্রমান্বয়ে ততই যেন কষ্টকর ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকল। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, 'আমার সঙ্গিনীরা সকলেই দুধপানের জন্য সন্তান নিয়ে ফিরছে আর আমাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে এ যেন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তার চাইতে বরং আমি সেই ইয়াতিম ছেলেটিকেই নিয়ে যাই (যা করেন আল্লাহ)।'

স্বামী বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, তুমি গিয়ে তাকেই নিয়ে এসো। এমনটিও হতে পারে যে, আল্লাহ এর মধ্যেই আমাদের জন্য কোন বরকত নিহিত রেখেছেন। এমন এক অবস্থা এবং মন-মানসিকতার প্রেক্ষাপটে শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে দুধ পান করানোর জন্য আমি গ্রহণ করলাম।'

তারপর হালীমাহ বললেন, 'যখন আমি শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নিয়ে নিজ আস্তানায় ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম তখন তিনি তাঁর দু'সীনা আমার বক্ষের সঙ্গে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন। তাঁর দুধভাই অর্থাৎ আমার গর্ভজাত সন্তানটিও পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করল। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এর পূর্বে তার এভাবে ঘুম আমরা কক্ষনোই দেখিনি।

অন্য দিকে আমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি এত বেশী পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে, আমরা উভয়েই তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে তা পান করলাম এবং বড় আরামের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলাম। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাত্রি যাপন শেষে যখন সকাল হল তখন আমার স্বামী বললেন, 'হালীমাহ! আল্লাহর শপথ, তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ।' উত্তরে বললাম, 'অবস্থা দেখে আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।'

হালীমাহ আরও বলেন যে, 'এরপর আমাদের দল মক্কা থেকে নিজ নিজ গৃহে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে বুকে নিয়ে আমার সেই দুর্বল এবং নিস্তেজ মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে আমিও তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমার সেই দুর্বল গাধাই সকলকে পিছনে ফেলে দ্রুত বেগে সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে যেতে থাকল। অন্য কোন গাধাই তার সাথে চলতে পারল না। এমনকি

অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে থাকল, 'ওগো আবূ যুওয়াইবের কন্যা! ব্যাপারটি হল কী বল দেখি। আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করো! এটা কি সেই গাধাটি নয় যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ, এটা সেই গাধাই যার উপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম।'

তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে বিশেষ রহস্যজনক কোন ব্যাপার ঘটেছে।'

এমন এক রহস্যময় অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা বনু সা'দ গোত্র নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোপূর্বে আমার জানা ছিল না যে, আমাদের অঞ্চলের মানুষের চাইতে অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ অধিকতর অভাবগ্রস্ত ছিল কিনা, কিন্তু মক্কা থেকে আমাদের ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে আমাদের বকরীগুলো চারণভূমি থেকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়িতে ফিরে আসত। দুগ্ধবতী বকরীগুলো দোহন করে আমরা তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করতাম। অথচ অন্য লোকেরা দুধ পেত না এক ফোঁটাও। তাদের পশুগুলোর ওলানে কোন দুধই থাকত না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালের মালিকেরা তাদের রাখালদের বলতেন, 'হতভাগারা যেখানে বনু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায় তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পার না?'

এ প্রেক্ষিতে আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য লোকের রাখালরাও সেই ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসত। সে সকল পশুর ওলানে দুধও থাকত না। অথচ আমাদের বকরীগুলো পরিতৃপ্তি এবং ওলানে পূর্ণমাত্রায় দুধসহকারে বাড়িতে ফিরত। প্রত্যেকটি কাজে কর্মে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সব কিছুর মধ্যেই আমরা বরকত লাভ করতে থাকলাম।

এভাবে সেই ছেলের পুরো দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি তাঁকে স্তন্য পান করানো বন্ধ করে দিলাম। অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এ শিশুটি এত সুন্দরভাবে বেড়ে

উঠতে থাকলেন যে, দু’বছর পুরো হতে না হতেই তাঁর দেহ বেশ শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠল। লালন-পালনের মেয়াদ দু’বছর পূর্ণ হওয়ায় আমরা তাঁকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সংসার জীবনে সচ্ছলতা ও বরকতের যে সুফল আমরা ভোগ করে আসছিলাম তাতে আমরা মনের কোণে একটি গোপন ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলাম যে, তিনি যেন আরও কিছুকাল আমাদের নিকট থাকেন। তাঁর মাতার নিকট আমাদের গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললাম যে, তাঁকে আরও কিছু সময় আমদের সঙ্গে থাকতে দিন যাতে তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু, মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারংবার অনুরোধ ও আন্তরিকতায় আশ্বস্ত হয়ে তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)- কে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।

বক্ষ বিদারণের ঘটনা

দ্বিতীয় দফায় বনু সা‘আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস (রাঃ) হতে সহীহুল মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী (সাঃ) যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, ‘এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।’ তারপর হৃৎপিন্ডটিকে একটি সোনার তস্তুরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা হালীমাহকে বলল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) নিহত হয়েছেন। হালীমাহ এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবী (সাঃ)-এর মুখমন্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে

তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবাযত্নে লিপ্ত হলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে

বালক নবী (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় দুধমা হালীমাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট ফেরত দেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমাহ এর ঘরে বড় হন। দুধমা'র ঘর থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর আমিনাহ ইয়াসরিব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তারপর শশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদীনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত। পথ চলার এমন এক পর্যায়ে আমিনাহ হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল তাঁর অসুখ। তারপর তিনি ইয়াতিম শিশু নবী (সাঃ) এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

পিতামহের স্নেহ ছায়ার আশ্রয়

পিতার মৃত্যুর পর রইলেন স্নেহময়ী মা, মাতার মৃত্যুর পর বেঁচে রইল বৃদ্ধ দাদা। মায়ের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত দাদা নিয়ে এলেন পিতা-মাতাহীন পুত্রকে নবুয়াত ও রিসালাতের স্থান মক্কায়। প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনাহর মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনাহ। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোন

অবলম্বনই রইল না। এ দুঃখ তাঁর শতগুণে বেড়ে গেল। অন্য দিকে তেমনি আবার ইয়াতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহসুধাও শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। মনে হতো যেন ঔরসজাত সন্তানের চাইতেও বেশী মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে যে, কা'বাহ ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকত। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোন সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু নবী (সাঃ) সেখানে আগমন করে সেই আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর চাচাগণ তাঁর হাত ধরে তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে শিশু নবী (সাঃ)-কে সেই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'ওকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! এ শিশুকে সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব'। তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চাল-চলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স যখন আট বছর দু'মাস দশ দিন তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। নাবী (সাঃ) এ দুঃখ-শোকের মুহূর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবূ ত্বালিব। হৃষ্টচিত্তে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবূ ত্বালিবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।

স্নেহশীল চাচার তত্ত্বাবধানে

পিতার অন্তিম অসিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবূ ত্বালিব অত্যন্ত যত্নসহকারে ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভবিষ্যতের নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবূ ত্বালিব তাঁকে যে আপন সন্তানাদির অন্যতম হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন তা-ই নয়, বরং

নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা দিয়েই তাঁকে প্রতিপালন করতে থাকেন। অধিকন্তু, পিতা আব্দুল মুত্তালিবের মতই তিনিও তাঁকে নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে তিনি বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন।

বাহীরা রাহেব

কথিত আছে যে, নবী (সাঃ)-এর বয়স যখন বার বছর (ভিন্ন এক বর্ণনায় বার বছর দু'মাস দশদিন)সেই সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে তিনি শাম দেশে (সিরিয়া) গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। বসরা ছিল শাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থান এবং হুরানের কেন্দ্রীয় শহর। এ শহরে একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক (রাহেব) বসবাস করতেন। তাঁর উপাধি ছিল বাহীরা এবং এ উপাধিতেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করেন তখন রাহেব গীর্জা থেকে বেরিয়ে তাঁদের নিকট আগমন করেন এবং আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। তিনি কিশোর নবী (সাঃ)-এর অবয়ব, আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি আখেরী নবী (সাঃ)। তারপর কিশোর নবী (সাঃ)-এর হাত ধরে তিনি বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব জাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন।'

আবূ ত্বালিব এবং কুরাইশের লোকজন বললেন, 'আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবে আখেরী নবী?' বাহীরা বললেন, 'গিরি পথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমনের সময় আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখন্ড ছিল না যা তাঁকে সিজদা করে নি। এ সকল জিনিস নাবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির অন্য কাউকেও কখনো সিজদা করে না। অধিকন্তু, 'মোহরে নবুওয়াত' দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর কাঁধের নীচে কড়ি হাড্ডির পাশে ফলের আকৃতি বিশিষ্ট একটি

দাগ রয়েছে, সেটাই হচ্ছে 'মোহরে নবুওয়াত'। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সূত্রে আমরা এ সব কিছু অবগত হতে পেরেছি।' অতঃপর তিনি তাদেরকে আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। এরপর বাহীরা আবূ ত্বালিবকে বললেন, 'একে সঙ্গে নিয়ে আর বিদেশ ভ্রমণ করবেন না। শীঘ্রই একে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ, এর পরিচয় অবগত হলে ইহুদী ও রুমীগণ একে হত্যা করে ফেলতে পারে।

এ কথা জানার পর আবূ ত্বালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সাথে মক্কা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ফিজার যুদ্ধ

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান। এ যুদ্ধ 'ফিজার যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত। কেননা বনু কিনানাহর বার্রায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাহদের উপর ক্বায়সদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাহদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, কোন পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়াত গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভুলে যায়। একে ফিজার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'।

একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ কালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে, ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয়ই তার সে আহবানে সাড়া দিব।

দুঃখময় জীবনযাপন

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন কাজ-কর্মের কথা পাওয়া যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকাবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দ্যেশে মাঠে গমন করতেন। মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরাতেন।

অধিকন্তু, কৈশোরে চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) সায়িব বিন আবূ মাখযূমীর সাথে ব্যবসা করতেন এবং তিনি একজন ভাল অংশীদার ছিলেন। না তোষামোদী ছিলেন, না

ঝগড়াটে ছিলেন। তারপর যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন খাদীজাহ (রাঃ)-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করেন। ইবনে ইসহাক্ব হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। যখন খাদীজাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয় তাঁকে তার চাইতে অধিকমাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।

খাদীজাহ (রা) এর সঙ্গে বিবাহ

সিরিয়া থেকে যুবক নবী (সাঃ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদীজাহ (রা.)-এর অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে ওঠে। অধিকন্তু, তাঁর দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মাদ (সাঃ) মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাঁকে পতি হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন বাসনা ক্রমেই তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর পূর্বে বড় বড় সরদার, নেতা ও প্রধানগণ অনেকেই তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি কোনটিই মঞ্জুর করেন নি। অথচ মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য তিনি যার পরনাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাবিহ এর নিকট ব্যক্ত

করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নাফীসা খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রস্তাব সম্পর্কে নাবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নবী কারীম (সাঃ) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ ত্বালিব এ ব্যাপারে খাদীজাহ (রাঃ)-এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইটি প্রাণ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

নবী কারীম (সাঃ) এবং খাদীজাহ (রাঃ)-এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদীজাহ (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নবী কারীম (সাঃ)-এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজাহ (রাঃ)-এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসিম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসিম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাত্বিমাহ ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'।

নাবী কারীম (সাঃ)-এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাত্বিমাহ (রাঃ) ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাত্বিমাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম (সাঃ)-এর ছয় মাস পর।

কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদ সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ ক্বাবা'হ গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, ক্বাবা'হ গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল (আঃ)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে ক্বাবা'হমুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় ক্বাবা'হগৃহের দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন ক্বাবা'হ গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

ক্বাবা'হ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ ক্বাবা'হ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং অন্যেরা ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন।

যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে সেজন্য কোন গোত্র কোন অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল 'হাজারে আসওয়াদ' তথা 'কৃষ্ণ প্রস্তর'টি স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে। এ ব্যাপারে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার বা পাঁচ দিন চললো।

সকলেই নিজে বা তাঁর গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। এই জেদ ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। এমন বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযূমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নবী কারীম (সাঃ)-এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল :

"আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এর উপর সন্তুষ্ট, তিনিই মুহাম্মাদ (সাঃ)।"

তারপর নবী কারীম (সাঃ) যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি এক খানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন। তাঁরা তাই করলেন। চাদর যখন কৃষ্ণ প্রস্তর রাখার স্থানে পৌছল তখন তিনি স্বীয় মুবারক হস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিলেন।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে ক্বাবা'হ গৃহের দৈর্ঘ আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই **'হিজর' 'হাতীম'** নামে প্রসিদ্ধ।

নবুয়াত লাভের পূর্ববর্তী সময়ের সংক্ষিপ্ত চরিত্র

বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে যে সকল সৎগুণাবলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সবগুলোর চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনার যথার্থতা, পারদর্শিতা এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল সুষমামন্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। শত অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অনাচার পরিবেষ্টিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। শরাবপায়ীদের সাথে বসবাস করেও কোনদিন তিনি শরাব স্পর্শ করেন নি, দেবদেবীর আস্তানায় যবেহকৃত পশুর গোশত তিনি কখনো খাননি এবং মূর্তির নামে অনুষ্ঠিত কোন প্রকার খেলাধূলায় তিনি কখনো অংশ গ্রহণ করেননি।

জীবনের প্রথমস্তর থেকেই তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত যাবতীয় মিথ্যা উপাস্যকে ঘৃণা করতেন এবং সে ঘৃণার মাত্রা এতই অধিক ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে আর অন্য কোন জিনিস এত নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল না। এমনকি লাত ও উযযার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা সহ্য করতেই পারতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর খাস রহমত, হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে লালিত পালিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। অতএব, যখনই পার্থিব কোন ফায়দা লাভের দিকে প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসীরের একটি বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে সকল

কাজ করেছে দু’বার ছাড়া আর কখনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি। কিন্তু সে দু’বারের বেলায় আল্লাহ তা‘আলা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পর কখনো সে ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন খেয়াল জন্মে নি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা আমাকে পয়গম্বরীর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

সহীহুল বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ক্বাবা’হ গৃহের নিমার্ণ কাজ চলছিল তখন নবী কারীম (সাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) প্রস্তর বহন করে আনছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, ‘স্বীয় লুঙ্গি আপন কাঁধে রাখ তাহলে প্রস্তর বহন জনিত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, ‘আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি’’। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেয়া হল। অন্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, এরপর তাঁর লজ্জাস্থান আর কোন দিনই দেখা যায় নি।

নবী কারীম (সাঃ)-এর কাজকর্ম ছিল সব চাইতে আকর্ষণীয়, চরিত্র ছিল সর্বোত্তম এবং মহানুভবতা ছিল সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তিনি ছিলেন সর্বাধিক শিষ্টাচারী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও সদাচারী। তিনি ছিলেন সব চাইতে দয়াদ্র চিত্ত, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যবাদী। মিথ্যা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় ছিলেন যে আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে ‘আল-আমীন’ বলে আহবান জানাতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন আরববাসীগণের মধ্যে সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজাহ (রাঃ) সাক্ষ্য দিতেন যে, ‘তিনি অভাবগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ন্যায্য দাবীদারদের তিনি সহায়তা করতেন এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য মাশহুর ছিলেন।

পয়গম্বরী যুগ - দাওয়াতের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পয়গম্বরী জীবনকে আমরা দুইটি অংশে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ১. মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় তের বছর

২. মদীনায় অবস্থান কাল দশ বছর

হেরা গুহার অভ্যন্তরে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দিনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দূরত্বে অবস্থিত হেরা পর্বত গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না।

পুরো রমাযান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুর অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সেই মহান সত্ত্বার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন।

জিবরাঈল (আ) এর আগমন

নবী কারীম (সাঃ)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুয়ত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়াতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক

পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবায়িত হতো সুবহে সাদিকের মত। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করলেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতে কারীমা নাযিল করে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নবুওয়াতের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চন্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নাবী কারীম (সাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন এবং সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।

আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ঘুমের অবস্থায় স্বপ্নযোগে, তিনি যখন যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাত রশ্মির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হতে থাকলেন। নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুণরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি বললেন, 'আমি পড়তে জানিনা'। তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়''। তিনি আবারও বললেন, 'আমি পড়তে জানিনা'। তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়-

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) [العلق:1: 3])

অর্থঃ সেই প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড থেকে। পড় সেই প্রভূর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।"

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নবী কারীম (সাঃ) কিছুটা অস্থির হয়ে খাদীজাহ বিনতে খুওয়ালিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা কমে গেলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর অস্থির ভাব লক্ষ্য করে খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কোন ভয় করবেন না, আপনি ধৈর্য ধরুন। আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।'

এরপর খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল উযযার নিকট নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে ওয়ারাকা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লেখতেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কী যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।' ওয়ারাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন ওয়ারাকার নিকট।

সব কিছু শোনার পর বিস্ময়-বিহবল কণ্ঠে ওয়ারাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই মানুষ যিনি মুসা (আঃ)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন।' তারপর বলতে থাকলেন,

'হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।' ওয়ারাকার মুখ থেকে এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একী! ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?'

ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।' তিনি আরও বললেন 'শুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই সত্যের বার্তা বাহক কারো আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বাগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।' তিনি আরও বললেন, 'মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ওহী বন্ধ

কত দিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সেই ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাগণ কয়েকটি মতামত পেশ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সঠিক কথা হলো ওহী বন্ধ ছিল মাত্র কয়েকদিন। নবুওয়াতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গুহায় কেবলমাত্র একমাস ধরে নির্জনে কাটাতেন; আর সেটি হলো প্রত্যেক বছরের রমাযান মাস। নবুওয়াতের বছর ছিল এ তিন বছরের শেষ বছর। এই রমাযানের পুরো মাস অবস্থানের শেষে আওয়াল মাসের প্রথম সকালে বিশ্বজাহানের নবী ওহী লাভে ধন্য হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। তাছাড়া বুখারী, মুসলিমের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ওহী বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয় বার ওহী অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নির্জনে পুরো মাস অবস্থানের পর ফিরে আসছিলেন সে সময়।

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বোধ করতেন। সহীহুল বুখারী শরীফের তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহী বন্ধ হয়ে

গেলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতই বিচলিত ও বিব্রতবোধ করতেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিবোধ এতই বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছেন তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ) আপনি আল্লাহর সত্য নবী।' এটা শুনে তাঁর অস্বস্তি ভাব কমে আসত আর তারপর ফিরে আসতেন ঘরে। আবারও কোন সময় কিছু বেশীদিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতো।

পুনরায় ওহীসহ জিবরাঈল (আ) এর আগমন

হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, নবী (সাঃ) -এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ রাববুল আলামীন কিছুদিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখেন, যাতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ঠিক তাই হলো, নবী কারীম (সাঃ) প্রথম ওহী নাযিলের অসুবিধা থেকে মুক্ত হয়ে যখন মন মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর বার্তা বাহক বা রাসূল মনোনীত হয়েছেন। এবং তাঁর নিকট যিনি ওহী নিয়ে আগমন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আসমানী দূত বা ওহীবাহক। এভাবে রহস্যাবৃত ব্যাপারটি যখন তাঁর নিকট পরিস্কার হয়ে গেল তখনই তিনি ওহী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) পুনরায় ওহী নিয়ে আগমন করলেন। সহীহুল বুখারীর মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট থেকে ওহী নিয়ে আগমন বন্ধের ঘটনা শ্রবণ করেন। ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

''আমি পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আকাশের দিকে তাকাতেই আমি সেই ফিরিশতাকে দেখতে পেলাম যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় আগমন করেছিলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে

কুরসীতে ছিলেন। ভয়ে বিস্ময়ে আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। তারপর আমার সহধর্মিণীর নিকট এসে বললাম, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তিনি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ১. ‘ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। [মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-৫] পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ করেন এরপর থেকে অবিরামভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে।

এ ক'টি আয়াত নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ওহী বন্ধ হওয়ার কয়েকদিন পর অবতীর্ণ হয়।

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার

সূরাহ মুদ্দাসসিরের উপযুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-অর্চনা ব্যতীত কোন দ্বীন ছিল না। তাদের সঠিক কোন হজ্জ ছিল না, তবে তারা হজ্জ করতো যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছে। তাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত কোন সৎচরিত্র ছিল না। তাদের কোন সমস্যা তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না। তা সত্ত্বেও মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ মক্কাবাসীই ছিলেন কা’বাহর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেমগণ। এ জন্যই দূরবর্তী স্থানের তুলনায় মক্কায় সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর।

ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল

যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সবচাইতে কাছের, সব চাইতে ঘনিষ্ঠ এবং সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্তু, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমন্ডলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নবী (সাঃ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর প্রতি এত বেশী শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহবানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নাবী- পত্নী খাদীজাহতুল কোবরা (রাঃ), তাঁর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ, তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবূ ত্বালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন শিশু ছিলেন এবং তাঁর সওর গুহার সঙ্গী আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)। এরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন।

তারপর আবূ বাকর (রাঃ) ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উসমান (রাঃ), জোবায়ের (রাঃ), আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ত্বালহাহ বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিলাল হাবশী (রাঃ)-ও ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পর ইসলাম কবূল করেন বনু হারিস বিন ফিহর গোত্রের আবূ 'উবায়দাহ 'আমির বিন জাররাহ (রাঃ), আবু সালামাহ বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমী (রাঃ), আরক্কাম বিন আবিল আরক্কাম (রাঃ), উসমান বিন মাযউন যুমাহী (রাঃ), এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কুদামা এবং আব্দুল্লাহ, উবায়দাহ বিন হারিস বিন মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়দ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরাত তামীমী (রাঃ), জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে

‘উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন ‘আস আল উমাবী ও তার স্ত্রী আমীনাহ বিনতে খালাফ, অতঃপর তার ভাই ‘আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমাহী ও তার স্ত্রী ফাতিমাহহ বিনতে মুখাল্লিল ও তার ভাই খাত্তাব বিন হারিস এবং তার স্ত্রী ফুকাইহাহ বিনতে ইয়াসার ও তার ভাই মা’মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবূ ‘আওফ, নাঈম বিন আবদুল্লাহ বিন নুহাম আদবী (রাঃ), এদরে সকলেই কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, মাসউদ বিন রাবী’আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রূমী, ‘আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ। উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন, উম্মু আইমান বারাকাত হাবশী, উম্মুল ফযল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ (আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী), আসমা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীর গুণে গুণম্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায় নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেই কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ

ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মুমিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে মনযোগী হলেন।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

''আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরাহ শু'আরার আয়াত এবং এ সূরাহয় সর্ব প্রথমে মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (আঃ)-এর নবুওয়তের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈলসহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফেরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদলবলে ফেরাউনকে নিমজ্জিত করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (আঃ)-এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হক পন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি চিত্র নবী কারীম (সাঃ) এবং সাহাবীগণের (রাঃ) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ সূরাহর মধ্যে নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথাঃ ফেরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবুল আইকার পরিণতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল কওম নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কী কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং ঈমানদারগণ অজস্র বিপদাপদে থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

আত্মীয় স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ

প্রথম সম্মেলন : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী কারীম (সাঃ) বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। সম্মেলনের শুরুতেই আবূ লাহাব আকস্মিকভাবে বলে উঠলেন, 'দেখ এরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। আবূ লাহাবের এ জাতীয় অর্থহীন আস্ফালনের প্রেক্ষাপটে নবী কারীম (সাঃ) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় সম্মেলনঃ এরপর নবী কারীম (সাঃ) স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তারপর তিনি বলেনঃ

"কল্যাণকামী পথ-প্রদর্শক স্বীয় আত্মীয়-পরিজনগণের নিকট কখনই মিথ্যা বলতে পারেন না, সেই আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নেই। বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ জানেন, তোমরা সকলেই সেভাবেই মৃত্যুর সম্মুখীন হবে যেমনটি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো এবং সেভাবেই পুনরায় উত্থিত হবে যেমনটি

তোমরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত হও। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদের সফলতা সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং পুণ্যের ফলশ্রুতি হিসেবে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আবাস স্থল জন্নাতে ও পাপাচারের ফলশ্রুতি হিসেবে কঠিন আযাব ও দুঃখ কষ্টের আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

এ কথা শুনে আবূ ত্বালিব বললেন, (জিজ্ঞেস করো না) আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এ টুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। আবূ লাহাব বললেনঃ 'আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমরাই ধরে নাও।' আবূ লাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবূ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

সাফা পর্বতের উপর

যখন নবী কারীম (সাঃ) খুব ভালভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আবূ ত্বালিব তাঁকে সাহায্য করবেন তখন এক দিবস তিনি সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করে জন সাধারণকে আহবান করলেন, তা শ্রবণ করে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সেখানে যখন সমবেত হলেন তখন তিনি সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর একত্ববাদ, স্বীয় নবুওয়ত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহবান জানালেন। এ আহবান শ্রবণ করে

সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকলকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবূ লাহাবও উপস্থিত ছিলেন।

তারপর নবী কারীম (সাঃ) বললেন,

"হে কুরাইশগণ! তোমরা বল, আজ যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা- সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস করবে?

সকলে সমস্বরে উত্তর করল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি।

তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন ,

"যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনাদেরকে (পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দন্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি ....।

অতঃপর সাধারণ ও বিশেষভাবে সকলকে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে বললেন

"হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সঁপে দিয়ে তার সন্তুষ্টি অর্জন করো।"

"হে বনু আব্দুল মুত্তালিব সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি তোমাদের উপকার বা অপকার কিছুরই মালিক নই। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না। আমার নিকট থেকে তোমরা ইচ্ছমতো কোন সম্পদ চেয়ে পার কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।"

যখন এ ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো সম্মেলন ভেঙ্গে গেল ও লোকজন যার যার মতো চলে গেল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু আবূ লাহাব মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে নবী (র)-এর নিকটে এসে বলে উঠলেন, 'তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো :

''আবূ লাহাবের হাত ধ্বংস হোক।' (আল-মাসাদ **১১১ : ১**)

এভাবে উচ্চকণ্ঠে আহানের উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের দাওয়াতের বাণী পৌছে দেয়া।

হজ্জযাত্রীদেরকে বাঁধা দেয়ার বৈঠক

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রকাশ্য প্রচার অভিযানের কয়েক মাস অতিবাহিত হতে না হতেই হজ্জের মৌসুম এসে উপস্থিত হল। যেহেতু এ মৌসুমে আরব ভূমির দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সেহেতু মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁদের নিকটে প্রচারাভিযান শুরু করবেন সেহেতু তাঁর সম্পর্কে সমাগত সকলের নিকট এমন এক কথা বলার প্রয়োজনবোধ করলেন যার ফলে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। এ প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য তাঁরা অলীদ বিন মুগীরার গৃহে সমবেত হলেন। অলীদ বললেন 'এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত ঠিক, কারো যাতে এ নিয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি না হয় এবং তোমাদের একজনের কথাকে অন্যজন যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।' অন্যেরা বললেন, 'আপনি একটা মোক্ষম মন্তব্য ঠিক করে দিন তাহলেই তা আমাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।'

অনেক আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাকে যাদুকর বলার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

যা হোক, তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করলেন তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। কিছু সংখ্যক কাফির মক্কায় আগমনকারী হজ্জযাত্রীগণের পথের পাশে

কিংবা পথের মোড়ে মোড়ে জটলা করে নবী কারীম (সাঃ)-এর প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলে হজ্জযাত্রীগণকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলেন। হজ্বের মৌসুমে হজ্ব যাত্রীগণের শিবিরে নবী কারীম (সাঃ) যখন আল্লাহর একত্ব এবং দ্বীনের তাবলীগ করতেন তখন আবূ লাহাব তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বলতেন, 'এর কথায় তোমরা কান দিয়ো না। সে মিথ্যুক এবং বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।

এভাবে দৌড় ঝাপের ফল হল যে, হজ্ব পালনের পর হাজীগণ যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাছাড়া তাঁরা এ কথাও অবগত হয়ে গেলেন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওয়ত দাবী করেছেন। এভাবে হজ্ব যাত্রীগণের মাধ্যমেই নাবী কারীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত এবং ইসলামের প্রাথমিক কথাবার্তা সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করল।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান

তাদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়ে। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কোন দুষ্টদুরাচারের পক্ষে তার সম্মুখে কোন অশ্লীল বা জঘন্য কাজ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন কখনই সম্ভব হতো না ।

নবী কারীম (সাঃ)-এর গুণাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল চাচা আবূ ত্বালিবের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই আবূ ত্বালিব এত মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, তার কথা অমান্য করা কিংবা তার গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার মতো দুঃসাহসিকতা কারোরই ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দুশ্চিন্তা, এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হল। সাত-পাঁচ এ জাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তিতর্কের পসরা নিয়ে তারা আবূ ত্বালিবের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তবে তা খুব হিকমত ও নম্রতার সাথে এবং মনে মনে

চ্যালেঞ্জ ও ভীতিপ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা গোপন করে যাতে করে তাদের বক্তব্য আবূ ত্বালিব খুব সহজেই মেনে নেয়।

আবু ত্বালিবের নিকট কুরাইশদের প্রতিনিধি দল

ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবূ ত্বালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন, মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছেন। অতএব, হয় আপনি তাকে এ জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদের মতই তার বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তার ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হব।

এর জবাবে আবূ ত্বালিব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাঙ্গে পাঁচরকম কথা-বার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ পূর্ণোদ্যমে তার প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। দীনের দায়োত প্রচার করতে থাকলেন এবং সেদিকে লোকেদেরকে আহ্বান জানাতে থাকলেন।

এদিকে কুরাইশগণও বেশি দেরি করলেন না যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাজ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত পূর্ণামাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেনই, বরং তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় তারা পূর্বের চেয়ে আরো ক্রোধ ও গরম মেজাজ নিয়ে আবূ ত্বালিবের নিকট পুনরায় আগমন করলেন।

আবূ ত্বালিবের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কুরাইশ প্রধানগণ আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আবূ ত্বালিব! আপনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইতোপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা থেকে বিরত

রাখুন। কিন্তু আপনি তা করেন নাই। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনা যে আমাদের পিতা পিতামহ এবং পূর্ব পুরুষদের গালি-গালাজ করা হোক, আমাদের বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হোক এবং আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করা হোক। আমরা আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি হয় আপনি তাকে সে সব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, নচেৎ তামাদের দু'দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেই থাকবে'।

কুরাইশ প্রধানগণের এমন কঠোর বাক্য বিনিময় এবং আস্ফালনে আবূ ত্বালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সেই মুহূর্তে নবী কারীম (সাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। চাচার আহবানে নবী কারীম (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলে আবূ ত্বালিব তাঁর নিকট কুরাইশ প্রধানগণের আলোচনা এবং আচরণ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।'

আল্লাহ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা রেখে তিনি বললেন,

'চাচাজান, আল্লাহর শপথ। যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু চাচাজান! আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।

পুনরায় আবু ত্বালিবের নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিগণ

বিগত চড়া-কড়া কথা সত্ত্বেও কুরাইশগণ যখন দেখল যে মুহাম্মাদ (সাঃ) বিরত থাকা তো দূরের কথা, আরও জোরে শোরে প্রচার-প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন এটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আবূ ত্বালিব মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে পরিত্যাগ করবেন না। একদিন যুক্তি পরামর্শ করে অলীদ বিন মুগীরাহর সন্তান ওমারাহকে সঙ্গে নিয়ে

আবূ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবূ ত্বালিব! এ হচ্ছে কুরাইশগণের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এবং ধার্মিক যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। এর পরিবর্তে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন। সে আপনার ও আমাদের পিতা, পিতামহদের বিরোধিতা করছে, আমাদের জাতীয়তা, একতা এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট'।

প্রত্যুত্তরে আবূ ত্বালিব বললেন, 'তোমরা যে কথা বললে এর চেয়ে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এ উদ্দেশ্যে দিচ্ছ যে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে লালন-পালন করব আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দিব এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! কক্ষনোই এমনটি হতে পারবে না'।

এ প্রেক্ষিতে নওফাল বিন আবদে মানাফের পুত্র মুতয়িম বিন আদী বলল : 'আল্লাহর কসম হে আবূ ত্বালিব! তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকজন তোমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা সুলভ কথাবার্তা বলছে, কাজকর্মের যে ধারা পদ্ধতি তোমার জন্য বিপজ্জনক তা থেকে তোমাকে রক্ষার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

এর জবাবে আবূ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা প্রসূত কোন কথাবার্তাই বলো নি। বরং তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছ। তবে ঠিক আছে তোমাদের যেটা করণীয় মনে করবে তাইতো করবে।

কুরাইশগণ যখন এবারের আলোচনাতেও হতাশ হলেন, তখন অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সরাসরি শত্রুতা পোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে বিভিন্নমুখী শত্রুতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে তার সম্মান-মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শত্রুতার হাতকে প্রশস্ত করে দিল। ফলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস, সংশয়-সন্দেহ, বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আবূ লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গ ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। সে ছিল বনু হাশিমের অন্যতম নেতা। সে অন্যান্যদের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যাপারে বেশি ভীত ছিল। সে ও তার স্ত্রী ছিল ইসলামের গোড়ার শত্রু। আবূ লাহাবের আচরণ ছিল অত্যন্ত মারমুখী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর আবূ লাহাব যে কত পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিলেন তার আরও বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তার ছেলে ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মেয়ের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কোচ্ছেদ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'মেয়ের সঙ্গে আবূ লাহাব তার দু'ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে তিনি তার দু'ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

তাঁর পাশবিকতার আরও একটি ঘটনা হচ্ছে নাবী কারীম (সাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ যখন মারা যান তখন তিনি (আবূ লাহাব) উল্লাসে ফেটে পড়েন, টগবগিয়ে দৌড়াতে তার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এ দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদরূপে পরিবেশন করেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর লেজকাটা (পুত্রহীন) হয়েছে। কোন কোন সময় তিনি নাবী (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন, যার ফলে তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যেত।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (যার নাম আরওয়া), নবী (সাঃ)-এর প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতনে তিনি ছিলেন স্বামীর যোগ্য অংশিদারিণী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চলার পথে এবং দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে কিংবা পুঁতে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অকথ্য

ভাষায় গালিগালাজ দেয়া, কটুক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজকর্মে তিনি লিপ্ত থাকতেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফেৎনা ফাসাদের আগুন জ্বলিয়ে দেয়া এবং উস্কানী দিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টি করা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এজন্যই আল কুরআনে তাঁকে الحطب (খড়ির বোঝা বহনকারিণী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবূ লাহাব পত্নী আবূ বাকর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আবূ বাকর! তোমার সঙ্গী আমার বদনাম করেছে। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'না, এ ঘরের প্রভুর শপথ! তিনি কোন কবিতা রচনা কিংবা আবৃত্তি করেন না। আর না, সে সব তিনি মুখেই আনেন। তিনি বললেন, 'তুমি সত্যই বলছ'। এ সব সত্ত্বেও আবূ লাহাব সেই সব লোহমর্ষক ঘটনাবলী ঘটিয়ে চলেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা ও প্রতিবেশী।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর তাদের জুলম নির্যাতনের ধারা ছিল এরূপ, তিনি যখন সালাতে রত হতেন তখন ছাগলের নাড়ি ভূড়ি ও মলমূত্র এমনভাবে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত তার উপর। উনুনের উপর হাড়ি পাতিল চাপিয়ে রান্নাবান্না করার সময় এমনভাবে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত হাড়ি পাতিলের উপর।

এরপর তারা দানবীয় আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলাঢলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল। মনে হল ওদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

এ রকম ভয়াবহ সংকটময় অবস্থায় এমন যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানগণ মুশরিকদের এমন বর্বোরোচিত অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারে। অতএব তিনি (সাঃ) দুটি হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে করে সহজ পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালানো যায় এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। সিদ্ধান্ত দুটি হলো:

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরক্কাম বিন আবিল আরক্কাম মুখযুমীর বাড়িকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে মনোনিত করলেন।

২. নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে হাবশায় হিযরত করার আদেশ করলেন।

আরকামের বাড়িতে

আরক্কাম বিন আবিল আরক্কাম মাখযূমীর বাড়িটি ছিল সাফা পর্বতের উপর অত্যাচারীদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তাদের সম্মেলন স্থান হতে অন্য জায়গায় অবস্থিত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বাড়িকেই মুসলমানদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করলেন। মুসলমানগণ যেন নিরাপদে তাদের ইবাদাত বন্দেগী চালিয়ে যেতে পারেন; রাসূল (সাঃ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয় তা তারা নিরাপদে গ্রহণ করতে পারেন এবং অত্যাচারী মুশরিকদের অজান্তে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে পারেন।

ঘটনাক্রমে এক দিন কিছু সংখ্যক কাফের কুরাইশ তাদের এভাবে সালাত পড়তে দেখে ফেলার পর অশ্লীল ভাষায় তাদের গালিগালাজ করতে থাকেন এবং আক্রমণ করে বসেন। মুসলিমগণও সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রতিহত করতে গিয়ে সা'দ বিন ওয়াক্কাস এক ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করেছিলেন যে তার শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম রক্তপাত।

আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত

জুলুম নির্যাতনের শুরুতে এর মাত্রা ছিল সামান্য। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরমে পৌঁছল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার

সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল সূরাহ যুমার।

এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় 'ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।' (আয-যুমার ৩৯ : ১০)

অত্যাচারের মাত্রা যখন ধৈর্য ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে কুরআন মাজীদ পড়তে এবং নামায আদায় করতে না দেয়ার মানসিক যন্ত্রণা যখন চরমে পৌঁছল তখন তারা দেশান্তরের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। তিনি বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।

মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

একই বছর রমাযান মাসে নবী কারীম (সাঃ) হারাম শরীফের উদ্দেশ্যে বের হন। কুরাইশগণের এক বিরাট জনতা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নাবী কারীম (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়েই আকস্মিকভাবে সুরায়ে 'নাজাম' পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল লোকেরা ইতোপূর্বে কুরআন শুনতো না এবং কোথাও কুরআন পাঠ করা হলে তারা শোরগোল করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করত যাতে তা শ্রুতিগোচর

না হয়। কারণ, তাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল কুরআন শুনলে তারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। কুরআনের ভাষায় ব্যাপারটি ছিল এরূপঃ

“এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।’ (ফুসসিলাত ৪১ : ২৬)

কিন্তু নবী কারীম (সাঃ) যখন এ সূরাহটি পাঠ আরম্ভ করলেন তখন তারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সম্পূর্ণটা শুনতে লাগলেন। ইতোপূর্বে কুরআন পাঠের সময় তারা যেভাবে গন্ডগোল করত সে রকম গন্ডগোল করা তো দূরের কথা বরং আরও গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে তারা তা শুনতে থাকল। তাদের অন্তরে ভিন্নমুখী কোন ভাবেরই উদ্রেক হল না। তারপর নবী কারীম (সাঃ) যখন এ সূরাহর শেষের আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকলেন তখন তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হতে থাকল। যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ-সম্বলিত শেষের আয়াতটি পাঠ করলেন :

“তাই, আল্লাহর উদ্দেশে সিজদাহয় পতিত হও আর তাঁর বন্দেগী কর। [সাজদাহ] (আন-নাজম ৫৩ : ৬২)

অতঃপর রাসূল (সাঃ) সিজদা করলেন এবং সাথে উপস্থিত মুশরিকরাও সকলে সিজদা করল।

কিন্ত পরক্ষণেই যখন তাঁরা স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, আল্লাহর কুরআনের অলৌকিকত্ব তাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট করে দিয়েছে যার ফলে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অথচ যাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করেন তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁরা আত্মগ্লানির অনলে দগ্ধীভূত হতে থাকেন। তাঁদের এ শোচনীয় মানসিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে যখন অনুপস্থিত অন্যান্য মুশরিকগণ এ আচরণের জন্য তাঁদের লজ্জা দিতে ও নিন্দা করতে থাকেন।

এ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা এবং তাঁদের সমালোচনা মুখর মুশরিকগণের দৃষ্টির মোড় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে অপবাদ দিয়ে একটি অপপ্রচার

শুরু করলেন। তাঁরা একটি নির্জলা মিথ্যাকে নানা রূপ ও রং দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে প্রচার শুরু করলেন যে, তিনি তাঁদের প্রতিমাসমূহের ইজ্জত ও সম্মানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেনঃ

((تِلْكَ الْغَرَانِيْـقُ الْعُلٰى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجٰى

(এরা সব উচ্চ পর্যায়ের দেবদেবী, তাদের শাফা'আতের আশা করা যায়।)

যা হোক, কুরাইশ মুশরিকগণের সিজদাহ করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমগণের নিকটও গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু সেই সংবাদের রকম-সকম ছিল ভিন্ন। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যেমন নানা রং-চংয়ের সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে যায় এ ক্ষেত্রেও হল ঠিক তাই। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরগণ খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। এ কথা শোনা মাত্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেকেরই মনে ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হল এবং পরবর্তী শওয়াল মাসেই তাঁদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কা থেকে তাঁরা এক দিনের পথের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন তখন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটি যেভাবে তাঁদের নিকট চিত্রিত করা হয়েছে প্রকৃত ঘটনাটি তা নয়। তাই দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়া অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে কিংবা কুরাইশগণের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় হিজরত ছিল খুবই কঠিন। কেননা প্রথম হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। নিরীহ, নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যার ফলে

কুরাইশগণের তরফ থেকে কোন অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহীহুল সালামতে গিয়ে পৌঁছলেন হাবশের সম্রাটের দরবারে।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্র

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুণ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে 'আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে (যিনি তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজ্জাশী এবং বেতরীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ দূত দ্বয়কে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে তারা সর্বপ্রথম বেতরীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যার ভিত্তিতে তারা মুসলিমগণকে হাবশ হতে বাহির করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে পাদ্রীগণ এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতরীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন।

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, 'মহামান্য সম্রাট! এরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের

পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহবান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা সম্রাট সমীপে পেশ করার জন্য সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমন কি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন্ ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন, 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহবান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক

অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু, নামায, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন।

হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষন্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, 'জী হ্যাঁ''।

নাজ্জাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।

জা'ফর (রাঃ) সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন: (كهيعص)

নাজ্জাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জাফরের তিলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী 'আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

এক পর্যায়ে 'আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বিন

রাবী'আহ বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু 'আমর বিন আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন।

পরের দিন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, 'আমর বিন আস বললেন, 'হে সম্রাট! এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (আীঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।'

তারপর নাজ্জাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেন নি। এ ঘটনার বর্ণনাকারিণী উম্মু সালামাহ বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকন সহ

কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।

অত্যাচারে কঠোরতা এবং নবী কারীম (সা) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদার পাত্র অথবা কারো আশ্রিত। এসত্ত্বেও তারা উদ্যত মুশরিকদের থেকে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবুও তারা মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে মুশরিকদের সম্মুখে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করতেন এবং সংগোপনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন এতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারতো না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে নির্দেশ দেন-

'কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আল-হিজর ১৫ : ৯৪)

এরপর অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তারা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতিষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল :

একদা আবূ লাহাবের পুত্র উতায়বা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ; আমি (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ) ও (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ) এ আয়াত দুটোকে অস্বীকার করছি। এর পরই সে নবী কারীম (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। সে জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর পাক মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রহমতে থুথু সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে নাই। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

"হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।"

একবার উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন তার ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তার অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে।

ইবনে ইসহাক্বের এক দীর্ঘ বর্ণনায় কুরাইশগণের এরূপ আভাষ পাওয়া যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস হতে ইবনে ইসহাক্ব তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে, এক দফা কুরাইশ মুশরিকগণ কাবাহ'র হাতীমে সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাকে বিদ্রপাত্মক কথাবার্তা বলে । তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নবী কারীম (সাঃ) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

'হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।

তাদের প্রতি নাবী (সাঃ)-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল যে তাদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ুই বসে রয়েছে। এমনকি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর সব চেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, 'আবূল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।'

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তার গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবূ বকর (রা.) তাকে বাচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন,

অর্থ : 'তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছে যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভু?'

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন যে, এটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি।'

এরপর মুশরিকগণ নবী কারীম (সাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বকরের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তার অবস্থা ছিল এরূপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল।

হামযাহ (রা) এর ইসলাম গ্রহণ

হামযাহ (রা) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগ। সম্ভবতঃ তিনি যুল হিজ্জাহ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

যদিও হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও আল্লাহর তা'আলার খাস রহমতেরই ফলশ্রুতি তবুও তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঘটনাটি হচ্ছে এরূপ, এক দিবসে আবূ জাহল সাফা পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নবী কারীম (সাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবী (সাঃ)-কে দেখে অনেক কটু কাটব্য করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বললে নাবী কারীম (সাঃ) তার কথাবার্তার কোন উত্তর দিলেন না। আবূ জাহল একটি পাথর তুলে নিয়ে নাবীজী (সাঃ)-এর মাথায় আঘাত করল। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল।

আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ানের এক দাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের উপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করছিল। হামযাহ (রাঃ) মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই (তখনো তাঁর হাতে তীর ধনুক ছিল এমতাবস্থায়ঃ) সে তাঁকে আবূ জাহলের অন্যায় অত্যাচার এবং নাবী (সাঃ)-এর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল। ঘটনা শ্রবণ করা মাত্র তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। এ মুহূর্তে বিলম্ব না করে তিনি এ সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটে চললেন যে, যেখানেই আবূ জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে সেখানেই তিনি তার ভূত ছাড়াবেন। তিনি তার খোঁজ করতে করতে গিয়ে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ও হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তার দ্বীনেই আছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। কাজেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো

তার দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের শক্তি এবং সম্মান দুই-ই বৃদ্ধি পেল।

উমার (রা) এর ইসলাম গ্রহণ

আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নবী কারীম (সাঃ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন। তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাঃ) বলতেন :

'হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে

আগমন করেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নবী কারীম (সাঃ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (সাঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

''অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রাসূলের বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।'' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) হচ্ছেন একজন গণক। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (সাঃ) তিলাওয়াত করলেনঃ

''এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান করে বসল।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে বনু যুহরা কিংবা বনু মাখযুমের কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত

অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ‘হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, ‘মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।’

লোকটি বলল, ‘মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, ‘মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ। লোকটি বলল, ‘উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।’

এ কথা শুনে উমার ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা’র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।’

তাঁর বোন উত্তর করলেন, ‘না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

উমার (রাঃ) বললেন, ‘সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

‘‘উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমন্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

বোন বললেন, ‘তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে পাঠ করলেন। বললেন, ‘এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সন্ধান বল।’

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।’

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। হামযাহ বললেন, ‘ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন

করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

''উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?'

তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

''হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।' নাবী (সাঃ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।'

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। এ কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্ব নিজ সূত্রের বরাতে উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, 'যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবূ জাহলই হচ্ছে তাঁর

সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষণাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, 'কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?' প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, 'তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন।

উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী কারণে লকব বা উপাধি 'ফারূক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার তিনদিন পূর্বে হামযাহ (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম হলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?

নাবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'অবশ্যই! সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।'

উমারের বর্ণনা : 'তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দু'টি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরোভাগে ছিলেন হামযাহ (রাঃ) আর অন্য সারির শিরোভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় যাঁতার আটার মতো হালকা ধূলি কণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। উমার (রাঃ) বলেছেন, 'কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাহকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তারা এত আঘাতপ্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারূক''।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত উমার (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা ক্বাবা'হগৃহের নিকট নামায আদায় করতে সাহস করিনি। সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহবান জানানো সম্ভব হল। দু'জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

একদিবসে তারা মাগরিবের পর কা'বাহর সম্মুখে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ডেকে পাঠালে তিনি (সাঃ) দ্রুত সেখানে হাজির হলেন এমন মনে করে যে, তাতে হয়তো কোন কল্যাণ রয়েছে। যখন তিনি (সাঃ) তাদের মাঝে আসন গ্রহণ করলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, সেদিন 'উতবাহ একা একা প্রস্তাব করাতে মুহাম্মাদ সম্মত হয়নি; তবে সবাই সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব করলে তা মেনে নিবেন অবশ্যই। কিন্তু তাদের প্রস্তাব শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা আমার ব্যাপারে এসব কি বলছ, আমি তোমাদের নিকটে কোন ধন-সম্পদ ও মর্যাদা চাই না। তোমাদের নিটক কোন

রাজত্ব চাই না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁর পক্ষ হতে আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে ভাল কর্মের উত্তম ফলাফলের শুভসংবাদ দেই এবং অন্যায় ও পাপকর্মের শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমি রিসালাতের বাণী পৌছিয়ে দিচ্ছি এবং সৎ উপদেশ প্রদান করছি। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলো দুনিয়া ও আখিরাতে এর ভাল পরিণাম ভোগ করবে। আর যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করে যাবো।

তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়ে আরেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। তা হলো তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাজে দাবি জানালো যে, নবী (সাঃ) যেন তাদের জমিন থেকে পাহাড়সমূহ দূরীভূত করে দেন, তাদের জমিন প্রশস্থ করে দেন। অতঃপর সেই জমিনে ঝর্ণা ও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। আর তিনি (সাঃ) যেন তাদের মৃতদেরকে জীবিত করে দেন; বিশেষ করে কুসাই বিন কিলাবকে। তিনি (সাঃ) এসব কর্ম সম্পাদন করলেই কেবল তারা ঈমান আনবে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূল (সাঃ) পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন।

এরপর তারা আবার অন্য একটি বিষয় উত্থাপন করলো- তারা বললো নবী (সাঃ) যেন তার প্রভুর নিকট একজন ফেরেশতাকেও নবী করে পাঠান যিনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দাবীকে সত্যায়ন করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে বাগ-বাগিচা, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণের অট্টালিকা প্রদান করেন। এবারও রাসূল (সাঃ) একই জবাব দিলেন।

অতঃপর তারা চতুর্থ একটি বিষয় উপস্থাপন করলো- মুহাম্মাদ যেহেতু তাদের শাস্তির ভয় দেখায় সুতরাং কুরাইশরা নাবী (সাঃ) এর কাছে আযাব আনয়ন করার দাবি জানালো এবং এও বললো তাদের উপর যেন আকাশ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ে তারা ভীষণ হুমকি দিল এমনকি তারা বললো, আমরা তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবনা, এতে হয় আমরা তোমাকে শেষ করবো অথবা আমরা নিঃশেষ হবো। তাদের এ ধরনের

ধমকি শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে স্বীয় পরিবারবর্গের নিকটে ফিরে গেলেন।

রাসূল (সা) কে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহলের অস্বীকার

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট হতে ফিরে আসলেন তখন আবূ জাহল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, 'কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ। আপনার সম্যকরূপে অবগত আছেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের ধর্মে কলঙ্ক রটাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষের নিন্দা করছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে খাটো বলে রটনা করছে এবং দেবদেবীগণের অবমাননা করছে। এ সব কারণে আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি যে, আমি এক খণ্ড ভারী এবং সহজে উঠানো সম্ভব এমন পাথর নিয়ে বসব এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন সিজদায় যাবে তখন সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে ফেলব। এখন এ অবস্থায় তোমরা আমাকে এক অসহায় ছেড়ে দাও, আর না হয় সাহায্য কর। বনু আবদে মানাফ এর পর যা চাই তা করুক'। উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যা করার ইচ্ছে করেছ তার করে ফেল।

সকাল হলে আবূ জাহল তার ঘোষণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যথা নিয়মে আগমন করলেন এবং সালাতে রত হলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে আবূ জাহলের কথিত কাণ্ড দেখার জন্য অপেক্ষামান রইল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিজদায় গমন করলেন তখন আবূ জাহল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে পৌঁছে এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। এ দিকে কুরাইশগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক দ্রুত তার নিকট এগিয়ে আসে এবং বলতে থাকে, আবূল হাকাম! ব্যাপারটি হল কী? কিছুই যেন বুঝে উঠছি না।

সে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা যা বলেছিলাম তা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর নিকটে গিয়ে পৌঁছলাম তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হায় আল্লাহ! কক্ষনো আমি এমন মস্তক, এমন ঘাড় এবং এমন দাঁতবিশিষ্ট উট দেখি নি। মনে হল সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে। ইবনে ইসহাক্ব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে সেখানে ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। আবূ জাহল যদি আমার নিকট যেত তাহলে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়ে যেত।

আবু ত্বালিব ও তার আত্মীয় স্বজনদের অবস্থান

আবূ ত্বালিব যখন দেখলেন যে, কুরাইশগণ সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন তিনি স্বীয় প্রপিতামহ আবদে মানাফের দু'পুত্র হাশিম ও মুত্তালেব বংশধারার পরিবার বর্গকে একত্রিত করেন। তারপর এ কথা বলে তাদের আহবান জানান যে, এতদিন পর্যন্ত তিনি এককভাবেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দেখাশোনা এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে যেহেতু তাঁর পক্ষে এককভাবে আর সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়, সেহেতু সম্মিলিতভাবে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানালেন। আবূ ত্বালীবের এই অনুরোধ আরবী সম্প্রদায়িকতার আকর্ষণের প্রেক্ষিতে সেই দু'পরিবারের সকলেই তা মেনে নিলেন। কিন্তু আবূ ত্বালীবের ভাই আবূ লাহাব তা গ্রহণ না করে কুরাইশ মুশরিকগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজকর্ম করার এবং তাদের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করলেন।

অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গিকার

মুশরিকদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো এবং তারা দেখতে পেল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফির সকলের সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেছে। এ সব কারণে মুশরিকদের হতবুদ্ধিতা আরো বেড়ে গেল।

পূর্বোলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবকিছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকগণ এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তারা কখনো বনু হাশিমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার জন্য মুশরিকগণের হাতে সমর্পন না করবে সে পর্যন্ত এ অঙ্গীকার নামা বলবৎ থাকবে।

এ অঙ্গীকার স্থিরীকৃত হল এবং অঙ্গীকারনামাটি ক্বাবা'হর দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবূ লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের কী কাফের, কী মুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শেয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়ত সপ্তম বর্ষের মুহারম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে। তবে এ ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যাপারে আরো মতামত রয়েছে।

তিন বছর শিয়াবে আবূ ত্বালিবের বয়কটরত অবস্থা

এ বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। উপবাসের অবস্থা এরূপ হয়ে যখন মর্মবিদারক কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকত তখন গিরি সংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব পড়েছিল, যা পৌঁছত তাও অতি সঙ্গোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করত তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সে সব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিত যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেত।

খাদীজাহ (রাঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। এক দিবস আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বোখতারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল এবং তার ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এ দিকে আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কিত সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন। তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যথেকে এক জনকে রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার পরিত্যাজ্য শয্যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজ্বের সময় নাবী কারীম (সাঃ) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ গিরি সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং হজ্বব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।

অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট

এরূপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ দু' বা তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুওয়াত ১০ম বর্ষের মুহাররম মাসে লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন বনু 'আমির বিন লুঈ গোত্রের হিশাম বিন 'আমর নামক এক ব্যক্তি। রাতের অন্ধকারে এ ব্যক্তি গোপনে গোপনে 'শেয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরি সংকটের ভিতরে খাদ্য শস্যাদি প্রেরণ করে বনু হাশিমের লোকজনদের সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এ ব্যক্তি এক দিন যুহাইর বিন আবূ উমাইয়া মাখযুমীর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। যুহায়েরের মাতা আতেকা হলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং আবূ ত্বালীবের ভগ্নী। তিনি যুহাইরকে সম্বোধণ করে বললেন, যুহাইর! 'তুমি এটা কিভাবে বরদাস্ত করছ যে, আমরা উদর পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করছি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করছি আর বনু হাশিম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন যাপন করছে। বনু হালীমাহর কথা শুনে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে যুহাইর বললেন, 'সব কথাই তো ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে একা আমি কী করতে পারি? তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহলে অবশ্যই আমি এ একরারনামা ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম''। হিশাম বলল, 'বেশতো, এ ব্যাপারে আমি আছি তোমার সঙ্গে।' যুহাইর বলল, বেশ, তাহলে এখন তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।'

এ প্রেক্ষিতে হিশাম, মুত্ব’ঈম বিন আদীর নিকটে গেলেন। হিশাম তাঁদের বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ভৎর্সনা করার পর ‘বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের দারুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘বংশীয় ব্যক্তিদের এত দুঃখ, কষ্টের কথা অবগত হওয়া সত্ত্বও তুমি কিভাবে কুরাইশদের সমর্থন করতে পার?’ মুত্ব’ঈম বললেন, ‘সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি একা কী করতে পারি? ‘হিশাম বললেন, ‘আরও একজন রয়েছে।’ মুত্ব’ঈম জিজ্ঞাসা করলেন সে কে? হিশাম বললেন, ‘আমি’’। মুত্ব’ঈম বললেন, ‘আচ্ছা তবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো’। হিশাম বললেন, ‘এটাও করেছি।’ বললেন, সে কে? উত্তরে বললেন, ‘যুহাইর বিন আবি উমাইয়া।’

মুত্ব’ঈম বললেন, ‘আচ্ছা তবে এখন চতুর্থ ব্যক্তির অনুসন্ধান করো’’। এ প্রেক্ষিতে হিশাম বিন ‘আমর আবুল বুখতারী বিন হিশামের নিকট গেলেন এবং মুতয়েমের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গেও ঠিক একইভাবে কথাবার্তা হল।

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন ৫ম ব্যক্তির খোঁজ করো। হিশাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন বনু হাশিমের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রাপ্যসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, ‘আচ্ছা যে কাজের জন্য আমাকে ডাক দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আরও কি কারো সমর্থন আছে? হিশাম ‘হ্যাঁ’ সূচক উত্তর করে সকলের নাম বললেন। তারপর তাঁরা সকলে হাজূনের নিকট একত্রিত হয়ে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, কুরাইশগণের অঙ্গীকারপত্রখানা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

পূর্বের কথা মতো পর দিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহাইর শরীরে একজোড়া কাপড় ভালভাবে লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করে নিলেন। তারপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মক্কাবাসীগণ! আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খাওয়া-দাওয়া করব, উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করব। আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে

থাকতে পারি না, যতক্ষণ ঐ অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক অঙ্গীকারপত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা না হচ্ছে।

আবূ জাহল মাসজিদুল হারামের নিকটেই ছিল- সে বললো, তুমি ভুল বলছ। আল্লাহর শপথ! তা ছিঁড়ে ফেলা হবে না।

প্রত্যুত্তরে যামআ বিন আসওয়াদ বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! তুমি অধিক ভুল বলছ। কিসের অঙ্গীকারপত্র! ওটা লিখার ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। আমরা ওতে সন্তুষ্টও ছিলাম না।''

অন্য দিক থেকে আবুল বুখতারী সহযোগী হয়ে বলে উঠল,

''যামআ ঠিকই বলেছো। ঐ অঙ্গীকারপত্রে যা লেখা হয়েছিল তাতে আমাদের সম্মতি ছিল না এবং এখনো তা মান্য করতে আমরা বাধ্য নই।' ওদের সমর্থনে হিশাম বিন 'আমরও অনুরূপ কথাবার্তা বললেন।

এদের আলাপ ও কথাবার্তা শুনে আবূ জাহল বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এ সব কথা আলাপ-আলোচনা করে বিগত রাত্রিতে স্থির করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ এ স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র কোথাও করা হয়েছে।' ঐ সময় আবূ ত্বালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ অঙ্গীকারপত্র সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক এবং আত্মীয়তা বিনষ্টকারী অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর চাচা আবূ ত্বালিবকে এ কথা বলেছিলেন এবং তিনিও কুরাইশগণকে এ কথা বলার জন্য মসজিদুল হারামে আগমন করেছিলেন।

আবূ ত্বালিব কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের অঙ্গীকারপত্রটির সমস্ত লেখা আল্লাহ প্রেরিত কীটেরা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু আল্লাহর নামটি বর্তমান আছে। এ সংবাদটি আপনাদের নিকট পৌঁছানোর জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি

তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ও আপনাদের মধ্য থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করবেন। কিন্তু তাঁর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটদের মাধ্যমে আপনারা আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছেন তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথায় কুরাইশগণ বললেন, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলছেন।'

এ দিকে আবূ জাহল এবং লোকজনদের মধ্যে বাকযুদ্ধ শেষ হলে মুত্ব'ঈম বিন আদী অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে, এক প্রকার কীট লেখাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু মাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল শুধু সেই লেখা গুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি।

তারপর অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা হল এবং এর ফলে বয়কটেরও অবসান ঘটল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং অন্যান্য সকলে শেয়াবে আবূ ত্বালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আবু ত্বালিবের নিকট পাঠানো কুরাইশদের শেষ প্রতিনিধি দল

গিরি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর পূর্বের মতো আবারও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অপরপক্ষে মুশরিকগণ যদিও বয়কট পরিহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তবুও পূর্বের মতই মুসলিমদের উপর চাপসৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকল। আবূ ত্বালিবও পূর্বের মতই জীবন বাজি রেখে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করতে থাকলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে থাকলেন। গিরি সংকটের আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময় মুশরিকগণ চিন্তা-ভাবনা করল যে, যদি আবূ ত্বালীবের মৃত্যু হয় এবং তারা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করে তবে এতে তাদের খুব বড় রকমের বদনাম

হয়ে যাবে। এ কারণে আবূ ত্বালীবের সামনেই মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এ চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে একটি কুরাইশ প্রতিনিধিদল আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং এটিই ছিল তাঁর নিকট অনুরূপ শেষ প্রতিনিধি দল।

ইবনে ইসহাক্ব এবং অন্যান্যদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, যখন অসুস্থ আবূ ত্বালিব শয্যাগত হয়ে পড়লেন এবং দিনে দিনে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকল তখন কুরাইশগণ এ মর্মে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল যে, 'হামযাহ ও উমার মুসলিম হয়ে গিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ধর্ম বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই, চল আমরা আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে একটি অঙ্গীকার আদায়ের কথা বলি। কারণ, এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ভীত এবং আতংকিত যে, এই ধারায় মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রচার অব্যাহত রাখলে লোকজনেরা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

যাহোক, এ কুরাইশ প্রতিনিধি দল আবূ ত্বালীবের নিকট গিয়ে পৌঁছল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন উতবাহ বিন রাবী'আহহ্, শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবূ জাহল বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, এবং আবূ সুফইয়ান বিন হারব। এ প্রতিনিধিদলে ছিল মোট পাঁচ জন সদস্য।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে আবূ ত্বালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়ে নিলেন এবং বললেন ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এরা হচ্ছেন তোমার স্বজাতীয় সম্মানিত ব্যক্তি। তোমার জন্যই এরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এরা চাচ্ছেন যে, তোমাকে কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করবেন এবং তোমাকেও তাঁদের কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁরা তোমার প্রতি কোন কটাক্ষ করবেন না এবং তুমিও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করবে না।

এক বর্ণনায় কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) বললেন, ‘চাচাজান! আপনি তাদেরকে এমন কথার প্রতি আহবান জানান না কেন যা প্রকৃতই তাদের মঙ্গল জনক।’

তিনি বললেন, তুমি কোন্ কথার প্রতি তাদের আহবান জানাতে বলছ?

নবী (সাঃ) বললেন, আমি এমন এক কথার প্রতি আহবান জানাচ্ছি যে, কথা মেনে নিলে সমগ্র আরব তাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং অনারবদের উপর তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বললেন,

‘‘আপনারা শুধুমাত্র একটি কথা মেনে নিন যার বদৌলতে আপনারা হয়ে যাবেন আরবের সম্রাট এবং আজম হয়ে যাবে আপনাদের অধীনস্থ।’’

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে যখন তার একথা শুনল তখন তারা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে গেল এবং মনে হল যেন তাদের হতবুদ্ধিতায় পেয়ে বসেছে। আবূ জাহল বলল, ‘আচ্ছা তুমি বলত ঠিক সে কথাটি কী? তোমার পিতার কসম, কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে একটি কেন দশটি বললেও আমরা মান্য করতে প্রস্তুত আছি।’ নবী (সাঃ) বললেন,

‘‘আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করেন তা পরিহার করুন।’’

নাবী কারীম (সাঃ)-এর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা হাতে হাত মারতে মারতে এবং তালি দিতে দিতে বলল, ‘মুহাম্মাদ (সাঃ) তুমি এটাই চাচ্ছ যে, সকল আল্লাহর জায়গায় মাত্র এক আল্লাহকে আমরা মেনে নেই। বাস্তবিক তোমার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক!’

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে বলল, ‘আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। অতএব, চলো এবং পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশ পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনের উপরেই অটল থাক যাবৎ আল্লাহ আমাদের এবং তার মধ্যে একটা মীমাংসা করে না দেন। এর পর তারা নিজ নিজ রাস্তায় চলে গেল।

আবু ত্বালিবের মৃত্যু

নানাবিধ কারণে আবূ ত্বালীবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ ব্যাপারে একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

মুসাইইব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নবী কারীম (সাঃ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ''চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।''

আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নাবী কারীম (সাঃ) বললেন, ''আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।' এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

''নবী ও মু'মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।' (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয়:

''তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।' (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবূ ত্বালীবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁট পৌঁছবে।

অনন্তকালের রহমতের পথে খাদিজাহ (রা)

আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মো'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনে খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন,

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে দান করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ (রাঃ) আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

দুঃখের উপর দুঃখ

প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ ত্বালীবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মো'মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মুত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নবী (সাঃ)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী (সাঃ) ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবূ বাকর (রাঃ) -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনে দাগানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এত কষ্ট দেন যা আবূ ত্বালীবের জীবদ্দশায় কেউ

কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন,

''পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।''

ঐ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে, ''যতদিন আমার চাচা আবূ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।''

এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নাবী কারীম (সাঃ) সেই বছরটির নাম রাখেন 'আমুল হুযন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সাওদাহ (রা) এর বিবাহ

নবুওয়ত ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওদা বিনতে যাম'আহ (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। এ মহিলা নবুওয়তের প্রথম অবস্থাতেই মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশের (আবিসিনিয়ায়) দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদাহ তাঁর সঙ্গে হাবশা হিজরত করেছিলেন। সাওদাহর স্বামী হাবশে মৃত্যুবরণ করেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈধব্যের পর ইদ্দত পালন শেষ হলে নাবী কারীম (সাঃ) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তারপর তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজাহ (রাঃ)-এর পর এ মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম স্ত্রী (বিবাহ পরম্পরায়) দ্বিতীয় স্ত্রী) কয়েক বছর পর ইনি নিজের পালা আয়িশাহ (রাঃ)-কে দান করে দিয়েছিলেন।

ত্বায়িফে রাসুলুল্লাহ (সা)

নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবী কারীম (সাঃ) ত্বায়িফ গমন করেছিলেন। ত্বায়িফ মক্কা থেকে আনুমানিক ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাতায়াতের এ দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ)। পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে কাবিলাহ বা গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এ আহবানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয় নি।

ত্বায়িফ গমন করে সাক্বীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে, যারা সকলেই সহোদর ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নাম ছিল যথাক্রমে আবদে ইয়ালাইল, মাসউদ ও হাবীব। ভ্রাতৃত্রয়ের পিতার নাম ছিল 'আমর বিন ওমাইর সাক্বাফী। তাঁদের সঙ্গে (সাক্ষাতের পর মহানাবী (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বলেন যে, সে কাবার পর্দা (আবরণ) ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন। দ্বিতীয়জন বললেন, 'নবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি? তৃতীয়জন বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।' তাঁদের এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং সেখান থেকে যাবার প্রাক্কালে শুধু বললেন, 'তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখ।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্বায়িফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।' ফলে ভগ্ন হৃদয়ে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল।

আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ত্বায়িফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়দ বিন হারিসাহই তাঁকে (সাঃ) রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। এভাবে আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত পথ চলতে গিয়ে নবী কারীম (সাঃ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবী'আহর পুত্র উতবাহ ও শায়বাহর। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দূরাচার ত্বায়িফবাসীগণ ফিরে যায়। এ বাগানটি ত্বায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নবী কারীম (সাঃ) আঙ্গুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নাবী কারীম (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এ দু'আ 'দুর্বলদের দু'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি দু'আ করলেন,

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু,তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই"।

এ দিকে রাবী'আহর পুত্রগণ যখন মহানাবী (সাঃ)-কে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত অবস্থায় দেখতে পেল তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল।

আদাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসের হাতে এক গোছা আঙ্গুর তারা নাবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই ক্রীতদাসটি যখন আঙ্গুলের গোছাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে তুলে দিতে চাইল তিনি তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন।

আদাস বলল, 'এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কী? সে বলল, 'আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং নিনওয়ার বাসিন্দা।' নবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'ভাল, তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তার গ্রামে তুমি বাস কর, তাই না? সে বলল, 'আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কিভাবে চিনলেন?'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী''। এ কথা শুনে আদাস নবী কারীম (সাঃ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।

এ ব্যাপারে দেখে রাবী'আহ পুত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখ, দেখ, ঐ ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়িয়ে দিল।' এর পর আদাস যখন তাদের নিকট ফিরে গেল তখন ভ্রাতৃদ্বয় তাকে বলল, 'বলত দেখি ব্যাপারটি কী? ঐ ভদ্রলোক দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিল।' সে বলল, 'হে আমার মনিব! এ ধরাধামে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউই নেই। তিনি আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা নবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানে না।'

দৈহিক যন্ত্রনার দাপটে হৃদয় মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি যখন 'কারনে মানাযেল' নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ রাববুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল (আঃ) সেখানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতামন্ডলী। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নবী (সাঃ) যদি ইচ্ছা করেন তা হলে তারা দু'পাহাড়কে একত্রিত করে দূরাচার মক্কাবাসীকে পিশে মারবেন।

তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বলেন, ‘আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের কে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফিরিশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! কথা এটাই, আপনি যদি চান যে এদেরকে আমি দু’পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে। নবী কারীম (সাঃ) বললেন, ‘না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না।

তারপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে ওয়াদীয়ে নাখলায় অবস্থান করেন। ওয়াদী নাখলায় তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন সে সময় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকট জিনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের দুটো জায়গায় এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরাহ আল-আহক্বাফে এবং অন্যটি সূরাহ জিনে।

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানাবী (সাঃ) জিনদের আগমনের কথা জানতেন না। আল্লাহ রাববুল আলামীন এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে জিনদের আগমনের কথা অবহিত করেন এবং তখন তিনি তা জানতে পারেন। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এটাই ছিল জিনদের প্রথম আগমন।

উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ

নবী কারীম (সাঃ)-এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি’রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল (আঃ) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নবীগণ (আঃ)-এর জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম আসমানের দরজা খোলা হল সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। জিবরাঈল (আঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন আপনার আদি পিতা আদম (আঃ)। একে সালাম করুন। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শ্রদ্ধাভারে সালাম জানান। আদম (আঃ) আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'খোশ আমদেদ!' হে বংশের মধ্যমণি! খোশ আমদেদ! হে আমার বংশের গৌরব!' তারপর তিনি তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মাসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (আঃ)-কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন। পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন ইমরান (আঃ)-কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন। তারপর রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে

যাওয়া হয়। সেখানে মুসা বিন ইমরান (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মুসা (আঃ) সম্ভ্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আমার পূর্বে এমন এক যুবককে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উম্মতগণ আমার উম্মতদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবেন।''

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর সঙ্গে, তিনি (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্ভ্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বায়তুল মা'মূর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রবেশ করে। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে না। এরপর তিনি (সাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে মোতি নির্মিত রশি, জান্নাতের মাটি হলো মেশক নামক সুগন্ধির তৈরী। অতঃপর তাঁর নিকট এমন বিষয় পেশ করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান। পর্দার একপাশে চির বিশ্ব জাহানের উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা, অন্যপাশে তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), মধ্যখানে রয়েছে দু'ধনুকের জ্যার সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চাইতেও কম। অনুষ্ঠিত হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, অশ্রুত পূর্ব সম্মেলন। তোহফা স্বরূপ বরাদ্দ করা হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাত।

এরপর শুরু হল নাবীজী (সাঃ)-এর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তনের পালা। এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হল মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে। উত্তরে নাবী কারীম (সাঃ) বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের কথা।

এ সময় পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল 'আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে আপনার উম্মত পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতেন। তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হচ্ছে নীল ও ফোরাত। তিনি জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখমন্ডলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না। তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশেণর জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্বিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণ ও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমন কি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না। পক্ষান্তরে আবূ বাকর (রাঃ) এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য

বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবূ বাকর (রাঃ) কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আক্কাবাহর প্রথম বায়আত

পূর্বে আমি বলেছি যে, একাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, 'আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব।'

এর ফল হল যে, পরবর্তী বছর যখন হজ্বের মৌসুম এল তখন বারোজন লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। এদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রেআব ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরাই ছিলেন যাঁরা পূর্বের বছর এসেছিলেন। এছাড়া অন্য সাত জন ছিলেন নতুন। এর মধ্যে কেবল দুজন আউস গোত্রের। তাছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। এ লোকগুলো মিনার 'আক্কাবাহর নিকটে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ঐ কথাগুলো সবই পরবর্তীকালে সম্পাদিত হুদায়বিয়াহর সন্ধিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'এসো, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবেনা, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোন ভাল কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সবের মধ্যে কোন কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হবে, চাইলে তিনি শাস্তি দিবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দিবেন। উবাদাহ

(রাঃ) বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নাবী (সাঃ)-এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।

মদিনায় ইসলাম প্রচারকের দল

অঙ্গীকার সম্পাদিত এবং হজ্বব্রত সম্পন্ন হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ লোকদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রথম ধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করলেন। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নব দীক্ষিত মুসলিমগণকে ইসলামের আহকাম এবং ধর্মের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল যারা এখনও শিরকের উপরেই রয়ে গেছে তাদের নিকট ইসলাম প্রচার করা। নবী কারীম (সাঃ) এ প্রবাসের জন্য প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে স্বনামধন্য এক যুবককে নির্বাচন করেন যার নাম হল মুসআব বিন উমায়ের আবদারী (রাঃ)। মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) মদীনায় গিয়ে আস'আদ বিন যুবারাহ (রাঃ)-এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াসরিববাসীদের নিকট প্রবল উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রচারণার কাজ আরম্ভ করলেন।

আক্বাবাহর দ্বিতীয় শপথ

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের সত্তর জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিক হজ্বযাত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইয়াসরিবের মধ্যে কিংবা মক্কার পথে ছিলেন এমন এক পর্যায়ে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকলেন, 'আমরা কতদিন আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এভাবে মক্কার পাহাড় সমূহের মধ্যে চক্কর ও ঠোক্কর খেতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফেলে রাখব?'

এ মুসলিমগণ যখন মক্কায় পৌঁছলেন তখন গোপনে নবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে এ কথার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবসে উভয় দল মিনায় জামরাই উলা, অর্থাৎ

জামরাই 'আক্কাবাহর নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হবে।

কা'ব বিন মালিক (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম। আইয়াম তাশরীকের মধ্যবর্তী দিবাগত রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল। আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন হারামও উপস্থিত ছিলেন (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। মুশরিকগণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে আগত অন্যান্য মুশরিকদের থেকে আমাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন হারামের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন ঠিকভাবেই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, 'হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডের ইন্ধন হয়ে না যান। এর পর তাঁকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং বললাম যে, 'আজ 'আক্কাবাহয় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথাবার্তা আছে'', তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে 'আক্কাবাহয় গমন করলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন।

- **বাইয়াতের দফা সমূহ**

ইমাম আহমাদ জাবির (রাঃ) বলেছেন, 'আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?'

তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২. অভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভৎর্সনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্রে ইবনে ইসহাক্ব যে আলোচনা করেছেন তাতে শেষ ধারার (৫) কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দানের পর বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার শপথ গ্রহন করছি যে, তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাযত করবে যে সকল জিনিস থেকে তোমরা আপন ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাক।' এ কথা বলার পরেই বারা (রাঃ) বিন মা'রুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধরে বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সুনিশ্চিত আমরা আপনাকে ঐ সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব, যে সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের সন্তান এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদের এ পদ্ধতি বাপদাদার কাল থেকে চলে আসছে।

- **বাইয়াতের পূর্ণতা লাভ**

বাইআতের শর্ত বা দফাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিক গুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্বর বলে উঠলেন, 'আস'আদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না। উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আস'আদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে

প্রস্তুত রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ মুসআব বিন উমায়েরের সাথে একযোগে মদীনায় ইসলাম প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। ফলে তিনিই সর্বপ্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।

কুরাইশদের উপর আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি

শয়তানের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করে, আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি ন্যায়ের সঙ্গে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি চান তাহলে আমরা কালই তরবারী নিয়ে মিনাবাসীর উপর আক্রমণ চালাই। তিনি (সাঃ) বললেন, 'আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি।' অতএব আপনারা নিজ নিজ আস্তানায় চলে যান।' কাজেই লোকেরা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এভাবেই সকাল হয়ে গেল।

হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী

ইসলামী দাওয়াতের জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি লাভ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা। এরপরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমগণকে এ নতুন দেশে হিজরত করার (দেশত্যাগ করার) অনুমতি প্রদান করেন। হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ সুবিধা ও আরাম আয়েশ ত্যাগ করে এবং ধন দৌলত ও সহায় সম্পদ সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মুশরিকবেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্তু পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে। মুসলিমগণ

এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, এর মধ্যে বিপদ লুকায়িত রয়েছে।

সহীহুল বুখারীতে 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (সাঃ) মুসলিমগণকে বললেন, 'আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে লাওয়ার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানের এলাকা। এরপর মুসলিমগণ মদীনার দিকে হিজরত করলেন। হাবশের সাধারণ মোহাজেরগণও মদীনায় হিজরত করলেন। আবূ বাকর (রাঃ)-ও মদীনায় হিজরতের জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'একটু থেমে যাও। কেননা আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবূ বাকর বললেন, 'আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনার জন্যও কি হিজরতের অনুমতি আশা করতে পারি।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। এরপর আবূ বাকর (রাঃ) থেমে গেলেন যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফর করতে পারেন। তাঁর কাছে দুটো উটনী ছিল। তিনি তাদের চার মাস ধরে ভালভাবে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুললেন যাতে তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পথ চলতে পারে।

দারুন নাদওয়াতে কুরাইশদের অধিবেশন

সাহাবীগণ (রাঃ) নিজ নিজ ধনসম্পদ ও স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন আউস ও খাযরাজ গোত্রের আবাসিক এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। চরম দুঃশ্চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, ইতোপূর্বে কোন কারণেই তাদের মধ্যে এত অধিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় নি। হিজরতের এ ব্যাপারটি ছিল তাদের মূর্তি পূজা, সামাজিক ঐক্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

তারা এটাও অনুধাবন করে ছিল যে, হিজরতকারী মুসলিমগণের মদীনায় আগমনের ফলে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং মদিনাবাসীগণকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাতে সক্ষম হলে, তা হবে মক্কাবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। মুশরিকেরা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, কাজেই তারা এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেল। এটা তাদের জানা কথা যে, এ বিপদের মূলসূত্র হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত। যার পতাকাবাহী হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সাঃ)।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'আক্বাবাহর দ্বিতীয় অঙ্গীকারের আনুমানিক আড়াইমাস পর মক্কার সংসদ ভবন দারুন নদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকগণ ইতিহাসের সব চাইতে ভয়াবহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশগোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয় ছিল এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীকে (নবী (সাঃ)-কে) হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়।

আবূ জাহল বলল, 'আমাদের প্রস্তাব হল প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহী ও শক্তিশালী যুবক নির্বাচন করা হোক এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারালো তরবারী দেয়া হোক। তারপর সকলেই তার দিকে অগ্রসর হোক এবং সকলেই এক সঙ্গে তলোয়ার মেরে তাকে হত্যা করুক। তাহলেই আমরা তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর এভাবে হত্যা করার ফল হবে রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হবে বনু আবদে মানাফ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। ফলে (একটি খুনের বদলে একশত উট প্রদান) দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়ে যাবে এবং আমরা তা আদায় করে দেব। শাইখ নাজদী বলল, 'এ যুবক যে কথা বলল সেটাই কার্যকর থাকল। যদি কোন প্রস্তাব ও সমর্থনের প্রশ্ন আসে তবে এটাই থাকবে, অন্যগুলোর তেমন কোন গুরুত্বই থাকবে না।'

মক্কার সংসদ এমনভাবে এক কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে দিনের মতো মুলতবী হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বাড়ি ঘেরাও

এক দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন, অন্য দিকে মক্কার পাপিষ্ঠরা দারুন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্ন তালিকাভুক্ত এগার জন পাপীষ্ঠকে নির্বাচন করা হল। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ

(১) আবূ জাহল বিন হিশাম, (২) হাকাম বিন আবীল 'আস, (৩) উক্ববা বিন আবূ মু'আইত্ব, (৪) নাযর বিন হারিস (৫) উমাইয়া বিন খাআফ, (৬) যাম'আহ বিন আসওয়াদ, (৭) তু'আইইমা বিন আদী, (৮) আবূ লাহাব, (৯) উবাই বিন খালাফ, (১০) নুবাইহ বিন হাজ্জাজ এবং তার ভাই (১১) মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল তিনি এশার সালাত পর রাত্রের প্রথম প্রহরে ঘুমিয়ে যেতেন এবং অর্ধ রাত্রিতে জেগে মাসজিদুল হারামে চলে যেতেন। তিনি (সাঃ) সেখানে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আলী (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলো, ধরনীতে নিস্তব্ধতা নেমে এল এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল- এমন সময় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাড়িতে হাজির হলো। তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরের দরজায় অবস্থান করলো। তাদের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুমিয়ে আছেন, তিনি যখনই বেন হবেন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করবে।

আবূ জাহল চরম অহংকার, উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নবী (সাঃ)-এর গৃহ ঘেরাওকারী আপন সঙ্গীদের বলল, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) বলছে যে, যদি তোমরা তার ধর্মে প্রবেশ কর, তার অনুসরণ কর তাহলে অনারবদের উপর আরবদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন উরদুনের বাগান সমূহের

মতো বাগান দেয়া হবে। আর যদি তোমরা তা না কর তাহলে তার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর পর আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে না কি অনন্ত কাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

যাহোক, জঘন্যতম এ পাপাচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল রাত দুপুরের পরক্ষণ। এ জন্য তারা রাত জেগে সময় কাটাচ্ছিল এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তাঁর বিজয়ই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়। তিনি যাঁকে বাঁচাতে চান কেউই তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পাকড়াও করতে চান পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতে কারীমায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

''স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (আল-আনফাল ৮ : ৩০)

হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর গৃহত্যাগ

কুরাইশ মুশরিকগণ তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে বললেন, 'তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন। তারপর নবী কারীম (সাঃ) গৃহের বাহিরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ধরে রাখলেন যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এ আয়াত কারীমাটি পাঠ করছিলেন,

‘‘তাদের সামনে আমি একটা (বাধার) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না।’ (ইয়া সীন ৩৬ : ৯)

এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেন নি। এরপর তিনি আবূ বাকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে ‘সাওর’ নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌঁছলেন।

এদিকে অবরোধকারীরা রাত ১২ টার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তার আগেই তাদের নিকট তাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার সংবাদ পৌঁছে গেল। অবস্থা হল এই যে, তাদের নিকট এক আগন্তুক এসে তাদেরকে সাঃ-এর দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল ‘আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, ‘আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে খতম করার অপেক্ষায় রয়েছি।

সে বলল, ‘উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছ। আল্লাহর কসম! কিছুক্ষণ পূর্বে মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি তোমাদের মাথার উপর এক মুষ্টি মৃত্তিকা ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন।’

এরপর দারুণ হতাশা ও ক্রোধের সঙ্গে তারা দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গৃহের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকল। চাদর জড়ানো অবস্থায় শায়িত আলী (রাঃ) দৃষ্টি গোচর হলে তারা বলতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! এই তো মুহাম্মাদ (সাঃ) শুয়ে আছে।’ তিনি শুয়ে আছেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এ দিকে যখন সকাল হল এবং আলী (রাঃ) বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন তারা বুঝতে পারল যে, সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ (সাঃ)-নেই। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ‘মুহাম্মাদ (সাঃ) কোথায়’’? হযরত আলী (রাঃ) বললেন, ‘‘আমি জানিনা।’’

- **গৃহ থেকে গুহা পর্যন্ত**

রাসূলুল্লাহ ২৭শে সফর চতুর্দশ নবুওয়াত খ্রিষ্টাব্দ মধ্যরাতের সামান্য কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বাহির হয়ে জান-মালের ব্যাপারে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আবূ বাকর (রাঃ)-এর গৃহে গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে পিছনের একটি জানালা দিয়ে বাহির হয়ে দুজনই পথ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকেন যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মক্কা নগরীর বাহিরে চলে যেতে সক্ষম হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তার সন্ধানে লেগে পড়বে এবং সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে তা হচ্ছে মদীনার কর্মব্যস্ত রাস্তা যা উত্তর দিকে গেছে। এ জন্য তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন যে পথটি ছিল সেই পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থাৎ ইয়ামান যাওয়ার পথ যা মক্কার দক্ষিণে দিকে অবস্থিত ছিল। এ পথ ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সুপ্রসিদ্ধ সওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ পর্বতটি ছিল খুব উঁচু, পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথ ছিল পাক জড়ানো। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। এ পর্বত গাত্রের এখানে-সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগলকে ক্ষত-কিক্ষত করে ফেলেছিল। বলা হয়েছে যে, তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্য আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য তাঁর পা জখম হয়েছিল। যাহোক, আবূ বাকর (রাঃ)-এর সহায়তায় তিনি পর্বতের শৃঙ্গদেশে অবস্থিত গুহার পাশে গিয়ে পৌঁছলেন। এ গুহাটিই ইতিহাসে 'গারে সওর বা সওর গুহা' নামে পরিচিত।

- **গুহায় প্রবেশ**

গুহার নিকট উপস্থিত হয়ে আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখন গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে দেখি এখানে অসুবিধাজনক কোন কিছু আছে কিনা। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে প্রথমে তা আমার সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে আপনাকে প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথা বলার পর আবূ বাকর (রাঃ) গর্তের ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে গর্তটি পরিষ্কার করে নিলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি

ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হল না। আবূ বাকর (রাঃ) ছিদ্র দুটোর মুখে নিজ পদদ্বয় স্থাপন করার পর ভিতরে আগমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরয করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আবূ বাকর (রাঃ)-এর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ)-এর পায়ে ছিদ্র মধ্যস্থিত স্বর্প কিংবা বিচ্ছু কোন কিছুতে দংশন করল। তিনি বিষে কাতর হয়ে উঠলেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর চক্ষু যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল এবং সেই আশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমন্ডলের উপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবূ বাকর (রাঃ)! তোমার কী হয়েছে?’’

তিনি আরয করলেন, ‘আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে। এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মুখ থেকে কিছুটা লালা নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে আবূ বাকর (রাঃ)-এর দংশন জনিত বিষব্যথা দূরীভূত হল। এ পর্বত গুহায় তাঁরা উভয়ে একাদিক্রমে তিন রাত্রি (শুক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি) অবস্থান করলেন। আবূ বাকর (রাঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহও ঐ সময় একই সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর বর্ণনাতে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও শক্তিসম্পন্ন যুবক। সকলের অগোচরে রাত গভীর হলে তিনি সেখানে যেতেন এবং সাহরী সময়ের পূর্বেই মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীগণের সঙ্গে মিলিত হতেন। এতে মনে হতো যেন তিনি মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। গুহায় আত্মগোপনকারীগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যে সকল ষড়যন্ত্র করত তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ)-এর গোলাম ‘আমির বিন ফুহাইরা পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাত এবং যখন রাত্রির এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকটে যেত এবং আত্মগোপনকারী নবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীকে (রাঃ) দুগ্ধ

পান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পরপর তিন রাত্রেই সে এরূপ করল। অধিকন্তু, আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকরের গমনাগমন পথে তাঁর পদ চিহ্নগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য 'আমির বিন ফুহাইরা সেই পথে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে যেত।

কুরাইশদের প্রচেষ্টা

এদিকে কুরাইশদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, নবী (সাঃ) তাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তারা একদম দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং ক্রোধের আতিশয্যে ফেটে পড়তে চাইল। তাদের ক্রোধের প্রথম শিকার হলেন আলী (রাঃ)। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে ক্বাবা'হ গৃহ পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং প্রায় এক ঘন্টা কাল যাবৎ তাঁর উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাল। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় আবূ বাকর (রাঃ)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল। দরজার করাঘাত শুনে আসমা বিনতে আবূ বাকর (রাঃ) বের হলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিতা কোথায় আছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহই ভাল জানেন, আমি জানি না আববা কোথায় আছেন?' এতে আবূ জাহল তাঁর গন্ডদেশে এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, সে ব্যথার চোটে চিৎকার করে উঠল এবং তার কানের বালী খুলে পড়ে গেল।

এরপর কুরাইশগণ সর্বত্র এ ঘোষণাও প্রচার করে যে, যদি কেউ মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং আবূ বাকর (সাঃ)-কে অথবা দুজনের যে কোন একজনকে জীবন্ত কিংবা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তাকে একশত উষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পুরষ্কার প্রদান করা হবে।

এই প্রচারনার ফলে অত্যন্ত জোরে শোরে অনুসন্ধান কাজ শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বাকর (রাঃ) যে পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন অনুসন্ধানকারীগণ সে গুহার প্রবেশ পথের পার্শ্বদেশে পৌঁছে গেল, কিন্তু আল্লাহ আপন কাজে জয়ী হলেন।

সহীহুল বুখারী শরীফে আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, 'আবূ বাকর (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে গুহায় থাকা অবস্থায় মাথা তুলে মানুষের পা দেখতে পেলাম।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী (সাঃ) তাদের মধ্যে কেউ যদি শুধু নিজ দৃষ্টি নীচের দিকে নামায় তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।' তিনি বললেন, 'আবূ বাকর (রাঃ) চুপচাপ থাক। আমরা দুজন, আর তৃতীয় জন আছেন আল্লাহ তা'আলা।'

মদিনার পথে

তিনদিন যাবৎ নিস্ফল দৌড়ঝাঁপ এবং খোঁজাখুঁজির পর যখন কুরাইশদের ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় অনুসন্ধান কাজের মাত্রা মন্দীভূত হয়ে এল এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত লাইসী যিনি সাহারা জনমানবশুন্য পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, মদীনায় পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য পূর্বে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও মজুরী নির্ধারিত হয়েছিল এবং তার নিকট দুটি বাহনও রাখা হয়েছিল। ঐ ব্যক্তি তখনো কুরাইশ মূর্তিপূজকদের দলভুক্ত থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁর সঙ্গে এ মর্মে কথাবার্তা ছিল যে, তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে তাকে গারে সওর পৌঁছতে হবে। সেই কথা মোতাবেক সোমবারের দিবাগত রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার বাহন দুটির মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবূ বাকর (রাঃ) সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন কিন্তু তাতে ঝুলানোর জন্য বন্ধনের রশি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন যাত্রার সময় হয়ে এল এবং আসমা (রাঃ) সামগ্রী ঝুলাতে গিয়ে দেখলেন তাতে বন্ধন রশি নেই, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ খুললেন এবং তা দু ভাগে ভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক

অংশের সাহায্যে সামগ্রী ঝুলিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে কোমর বাঁধলেন। এ কারণেই তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নিত্বাক্বাইন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বাকর (রাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করলেন। 'আমর বিন ফুহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত মদীনা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরলেন।

কুবাতে আগমন

৮ই রবিউল আওয়াল, ১৪ই নববী সনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুবাতে আগমন করেন। 'উরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনায় রয়েছে যে, মদীনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ শুনেছিলেন এজন্য তাঁরা প্রত্যেক দিন সকালে বের হয়ে হাররার দিকে গমন করতেন এবং তার পথ চেয়ে থাকতেন। দুপুরে রোদ যখন অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠত তখন তাঁরা গৃহে ফিরতেন। এক দিবসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর মুসলিমগণ যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন একজন ইহুদী তাঁর নিজের কোন কাজে একটা টিবির উপর উঠলে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার সঙ্গীদের দেখতে পায়। সাদা কাপড়ে আবৃত অবস্থায় তাঁরা যখন আসছিলেন তখন তাঁদের পোষাক হতে যেন চাঁদের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে সে আত্মহারা হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'ওগো আরবের লোকেরা! তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, তোমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি ঐ যে এসে গেছেন।' এ কথা শোনামাত্রই মুসলিমগণ অস্ত্রাগারে দৌড় দিলেন এবং অস্ত্র শয্যায় সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত হলেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : এর মধ্যেই বণী 'আমর বিন আউফ গোত্রের (কুবার বাসিন্দা) লোকজনদের শোরগোল উঁচু হয়ে উঠল এবং তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুসলিমগণ নবী কারীম (সাঃ)-এর আগমনে তাঁকে খুশ আমদেদ জানানোর উদ্দেশ্যে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সমবেত হতে থাকল। তিনি তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত

হলে সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়ালেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শান্তির আবরণে আচ্ছাদিত ছিলেন এবং আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল,

‘‘তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেক্কার মু’মিনগণ আর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী।’ (আত্-তাহরীম ৬৬ : ৪)

‘উরওয়া বিন যুবাইর (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে যে, লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সঙ্গে নিয়ে ডানদিকে ফিরলেন এবং ’’আমর বিন আওফ গোত্রে গমন করলেন। সে সময়টা ছিল রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার। অতঃপর আবূ বকর (রাঃ) লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য দাঁড়ালেন আর রাসূল (সাঃ) চুপ করে বসে থাকলেন। সে সকল আনসার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এখন পর্যন্ত দেখেন নি তারা একের পর এক আসতে থাকলেন তাঁকে স্বাগতম জানাতে। পুরো মদীনা যেন স্বাগতম জানানোর জন্য কুচকাওয়াজ করছিল। সে দিন এমনই একটা দিন ছিল মদীনার ইতিহাসে এমন দিন আর আসেনি।

এদিকে আলী (রাঃ) মক্কায় তিন দিন অবস্থানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট লোকদের গচ্ছিত আমানত আদায় করার পর পদদলে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর মদীনায় পৌঁছে তিনি কুবায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কুলসুম বিন হাদামের বাড়িতেই অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুবাতে চারদিন অথবা দশ দিন থেকে বেশী অথবা পৌঁছা ও যাত্রার দিন ছাড়া চবিবশ দিন অবস্থান করেন। আর এ সময়ের মধ্যেই মসজিদে কুবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাতে সালাতও আদায় করেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এটা হচ্ছে সর্ব প্রথম মসজিদ যার বুনিয়াদ তাকওয়া (আল্লাহ ভীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম দিনে শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে আরোহণ করলেন। আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর রাদীফ (পিছনে আরোহণকারী) ছিলেন। তিনি বনু নাজ্জারদেরকে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা তরবারী ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদেরসহ মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। তারপর বনু সালিম বিন আউফের আবাসস্থানে পৌঁছলে জুমার সালাতের

সময় হয়ে যায়। তিনি এ স্থানে জুমা পড়লেন। সেখানে এখনো মসজিদ রয়েছে। সেখানে মোট একশত লোক ছিলেন।

মদিনায় প্রবেশ

জুমআর সালাত শেষে নবী (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিব পরিবর্তে মদীনাতুর রাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের গুঞ্জণ ধবনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নিম্নের কবিতার চরণগুলো সুর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

طلع البدر علينا*من ثنيات الوداعوجب الشكر علين*ما دعا لله داعأيها المبعوث فينا*جئت بالأمر المطاع

‘‘দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।’

‘‘কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।’

তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভূ)

আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার বাসাতেই অবস্থান করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ‘উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদের্শিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে।

কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দূরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চেয়েছিলেন তাঁর নানার গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) উষ্ট্রের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানের সাথে রয়েছে। এদিকে আস'আদ বিন যুরারাহ (রাঃ) এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।

সহীহুল বুখারী শরীফে আদাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'কোন্ লোকের বাড়ি আমার থেকে নিকটে''? আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজা।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবূ বাকর (রাঃ) দুজনকেই সেখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

কিছুদিন পর নবী পত্নী উম্মুল মু'মিনীন সওদা (রাঃ) এবং নাবী তনয়া ফাত্বিমাহ (রাঃ) ও উম্মুল কুলসুম (রাঃ) এবং উসামা বিন যায়দ (রাঃ) ও উম্মু আয়মান (রাঃ) মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন।

'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় পৌঁছার পর আবূ বাকর (রাঃ) ও বিলাল (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আববাজান! আপনি কেমন আছেন? তারপরে বিলালকে লক্ষ্য করে

বললাম আপনি কেমন আছেন? তিনি অর্থাৎ ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যখন আবূ বাকর (রাঃ)-এর জ্বর আসত তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করতেন,

অর্থঃ প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও নিকটবর্তী।

বিলালের অবস্থা যখন একটু সুস্থ থাকত তখন তিনি নিজের দুঃখপূর্ণ স্বর উঁচু করে বলতেনঃ

‘হায় যদি আমি জানতাম যে, আমার কোন একরাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) এবং আমার পাশে ইযখির ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোন দিন কি মাজিন্না ঝর্ণাতে অবতরণ করতে পারব এবং আমি সামা ও তুফাইল পাহাড় দেখতে পাব?’

‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এ প্রলাপের সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন,

‘‘হে আল্লাহ, আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার ‘সা‘’ ও ‘মুদ্দে’ (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহফাহ’য় পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ তাঁর দু‘আ শুনলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।’’

মদিনার প্রথম পর্যায়

- **নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ন**

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করে বনী নাজ্জার গোত্রের আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ‘ইন-শা-আল্লাহ এটাই হবে আমার অবস্থান।’ তারপর তিনি আবূ আইউব আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তর হয়ে যান।

- **মসজিদে নববী নির্মাণ**

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রথম কাজ হল মসজিদে নববীর নির্মাণ। আর এজন্য ঐ স্থানটিই নির্ধারিত হল যেখানে সর্ব প্রথম তাঁর উটটি বসে পড়েছিল। এ স্থানটির মালিক ছিল দু'জন অনাথ বালক। তিনি ঐ স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন,

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালেরই জীবন। অতএব আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মধারা সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করছিল। কাজে তারাও বলছিলেন,

অর্থঃ 'যদি আমরা বসে থাকি এবং নবী (সাঃ) কাজ করেন, তাবে আমাদের এ কাজ হবে পথভ্রষ্টতার''।

এ জমিতে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক কবর ছিল। কিছু অংশ পতিত ছিল। তাছাড়া খেজুর ও গারকাদের কয়েকটি গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেন, অসমতল জায়গাটা সমতল করলেন এবং খেজুর ও অন্য গাছগুলো কাটিয়ে ক্বিবলাহর দিকে খাড়া করে দিলেন। সে সময় ক্বিবলাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাস। দরজার দু'বাহুর স্তম্ভগুলো পাথর দ্বারা এবং দেওয়াল নির্মিত হল কাঁচা ইট দিয়ে। ছাদের উপর খেজুরের ডালপালা চাপিয়ে আবরণ তৈরি করা হল আর খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে থাম তৈরি করা হল। মেঝেতে বিছানো হল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। ঘরের তিন দরজা লাগানো হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন যার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুরের গুঁড়ির বর্গা দিয়ে। ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে তৈরি। এগুলো ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন নাবী পত্নীগণের (রাঃ)

আবাস কক্ষ। এ কক্ষগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাসা থেকে এ আবাসস্থানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।

মসজিদে নাবাবী শুধুমাত্র সালাত আদায়ের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের উৎসস্থল। এ মসজিদেই ছিল এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে জাহেলিয়াত জীবনের দীর্ঘ কালের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা হয়েছিল, এ মসজিদেই বসত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শ সভা। অধিকন্তু, এ মসজিদেই ছিল অনেক নিবেদিত সাহাবী (রাঃ)-এর আবাসস্থল, যাঁদের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে কিছুই ছিল না।

হিজরতের প্রথম দিকেই আযান প্রথা প্রচলিত হয়। এটা সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনের জন্য এমন মনোজ্ঞ আহবান যা প্রত্যহ পাঁচবার প্রচারিত হয় মসজিদের মিনার থেকে। মসজিদে নাবাবীতে যখন আযান দেয়া হতো এবং আযানের গুরু গম্ভীর আওয়াজ যখন আকাশের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত, তখন একদিকে আল্লাহ প্রেমিক মুসলিমদের অন্তর ভালবাসায়, ভক্তিতে, আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠত, অন্যদিকে কাফির মুশরিকদের অন্তর ভয়-ভীতিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠত।

- **মুসলিমদের মধ্যে পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার**

উপরি উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মতই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমগণের মধ্যে আরও একটি অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করেছিলেন যার দ্বারা জাহেলিয়াত যুগের সকল গোত্রীয় গন্ডগোলের মূলোৎপাটন ঘটে। এ অঙ্গীকারনামার দফাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল-

১. এরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মানব থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠি।

২. কুরাইশ মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত (হত্যার বিনিময়) দেবেন এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দীদের মুক্তিপণ

প্রদান করবেন। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত প্রদান করবেন এবং তাঁদের সকল দল ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আপন বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবেন।

৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীন (অনাথ) কে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা মোতাবেক প্রদান এবং সম্মান করা থেকে বিমুখ করবেন না।

৪. সকল ধর্মপ্রাণ মু'মিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে অথবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গন্ডগোলের পথ বেছে নেবে।

৫. মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।

৬. কোন কাফিরের বদলে কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবেন না।

৭. কোন মু'মিন কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবেন না।

৮. আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত যিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।

৯. যে সকল ইহুদী মুসলিমগণের অনুগামী হবে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমগণের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।

১০. মুসলিমগণের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবেন না, বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবেন।

১১. মুসলিমগণ ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবেন যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১২. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোন মু'মিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে যদি নিহতের অভিভাবক রাজী থাকেন।

১৪. যে সকল মু'মিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কিছু হালাল হবে না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁরা বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন।

১৫. কোন মু'মিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গুন্ডগোল সৃষ্টি করে (বিদ'আতী) তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা তাকে আশ্রয় দেয়, কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেয়। যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গযবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই যে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ)-এর বিধি-বিধান মতো ফয়সালার ব্যবস্থা করবে।

- **ইহুদিদের সাথে চুক্তি**

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নবী কারীম (সাঃ) যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানাবী (সাঃ)-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের

সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল যার উল্লেখ কিছু পূর্বে করা হয়েছে। এ সাম্রাজ্য পরিচালনের ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়।

সুশৃঙ্খল এবং শান্তি-স্বস্তিময় অঞ্চলের সীমারেখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নবী কারীম (সাঃ) পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেন।

মুসলিমদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা

এরপর সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন এবং উমাইয়া ইবনু খালফের অতিথি হন। তিনি উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার জন্য এমন এক সময়ের ব্যবস্থা করে দাও যখন আমি নির্জনে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করতে পারি। সেই মোতাবেক উমাইয়া খরতপ্ত দুপুরে তাকে নিয়ে পথে বের হলে পথে আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, 'হে আবূ সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে?'

উত্তরে উমাইয়া বলল, 'এ হচ্ছে সা'দ (রাঃ)।'

আবূ জাহল তখন সা'দ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি দেখছি যে, তুমি বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করতে রয়েছ, অথচ তোমরা বেদ্বীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবূ সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

তার একথা শুনে সা'দ (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমার এমন কাজে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব যা তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হবে মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথটি।

মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান

কুরাইশ মুশরিকগণ মদীনার মুহাজিরদেরকে ধমকের সূরে বলে পাঠাল, 'মক্কা হতে তোমরা নিরাপদে ইয়াসরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড় না যেন। এটুকু জেনে রেখ যে, ইয়াসরিবে চড়াও হয়েই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

তাদের এ ধমক শুধু যে কথাবার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ ব্যাপারে তারা গোপনে গোপনে তৎপরও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, তিনি সতর্কতা অবলম্বন না করে পারেন নি। নিরাপত্তার খাতিরে হয় জাগ্রত অবস্থায় তিনি রাত্রি যাপন করতেন, নতুবা সাহাবীদের প্রহরাধীনে ঘুমোতেন। যেমনটি সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিম শরীফে 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'মদীনায় আগমনের পর একদা রাত্রি বেলায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন যে, আজ রাত্রে যদি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি এখানে এসে পাহারা দিতেন (তাহলে কতই না ভাল হতো)।

আমরা ঐ অবস্থাতেই ছিলাম এমন সময় অকস্মাৎ অস্ত্রের ঝনাঝনানি আমাদের কর্ণগোচর হল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, 'কে'? উত্তরে শ্রুত হল 'আমি সা'দ ইবনু আবী অক্কাস' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গভীর রাত্রে তোমার এখানে আগমনের কারণ কী'? জবাবে তিনি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার মনে বিপদের

আশঙ্কা উদ্রেক হওয়ায় আপনাকে পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তার একথা শুনে তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাহারা দেয়ার ব্যাপারটি শুধু কয়েকটি রাত্রির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং এটা ছিল পর্যায়ক্রমিক এবং স্থায়ী ব্যবস্থা। 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাহারা দেয়া হতো। তারপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

''(হে রসূল!) মানুষ হতে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করবেন।' (আল-মায়িদাহ ৫ : ৬৭)

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুববা (ঘর বিশেষ) থেকে মাথা বের করে বললেন,

''হে জনমন্ডলী! তোমরা ফিরে যাও। মহামহিমান্বিত প্রভূ পরওয়ার দেগার আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।''

যুদ্ধের অনুমতি

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ) [الحج: 39].

" যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' (আল-হাজ্জ ২২ : ৩৯)

তারপর এ ধরণের আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে বলে দেয়া হয় যে, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করণ। যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হলও তা শুধু কুরাইশদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অনুমতির বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তা ওয়াজিবের পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এ নির্দেশ কুরাইশ ব্যতিত অন্যাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়।

বদর যুদ্ধের পূর্বের সারিয়্যাহ ও গাযওয়া সমূহ

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ায় এ দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতার কাজ শুরু হয়ে যায়। পরিভ্রমণকারী প্রহরীরূপে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে টহল দিতে শুরু করেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আভাষ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের এ টহলদারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশ-পাশের পথসমূহের উপর সাধারণভাবে এবং মক্কা থেকে আগত পথগুলোর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এভাবে বিভিন্ন পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং একই সঙ্গে এ সকল পথের আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করা। সর্বোপরি, মুসলিমগণ যাতে আরব উপদ্বীপে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ও গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল-

১। সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী

২. সারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযান

৩. সারীয়্যায়ে খার্রার

৪. গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান

৫. গাযওয়ায়ে বুওয়াত বা বুওয়াতের অভিযান

৬. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান

৭. গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহ

৮. নাখলাহ অভিযান

এগুলো হচ্ছে বদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়া। এগুলোর কোনটাতেই সুস্পষ্ট ও হত্যার তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যে পর্যন্ত না কুরয ইবনু জাবির ফাহরীর নেতৃত্বে মুশরিকরা মদীনার সন্নিকটস্থ চারণ ভূমি থেকে কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এর সূচনাও মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। ইতোপূর্বে তারা যেমন বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল, গবাদি পশু লুট কারার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ একটি ঘটনা।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হল এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। যে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা তারা এতদিন করে আসছিল শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই তাদের পতিত হতে হল। এ বিষয়টিও তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছা করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্ধত আচরণ থেকে বিরত রইল না। তারা জুহাইনা এবং বনু যমরাহ গোত্রদ্বয়ের মতো সন্ধির পথ অবলম্বনের পরিবর্তে ক্রোধ, হিংসা ও শত্রুতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল যে, মুসলিমদের আবাসস্থানে আক্রমণ

চালিয়ে তারা তাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ লক্ষ্যে এক সুসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীসহ তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হল।

গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা - ইসলামের প্রথম ফয়সালাকারী যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ যা মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে দ্বিতীয় হিজরীতে সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক কম হয়েও মক্কার কাফির শক্তিকে পরাজিত করে। এর মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। এজন্য এই যুদ্ধকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলা হয়। আল-কুরআনে এই দিনকে ইয়াওমূল ফুরক্বান বলা হয়।

- **বদর যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ :-**

২য় হিজরী সনের ১৭ই রামাযান ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যা ছিল মদীনায় হিজরতের মাত্র ১ বছর ৬ মাস ২৭ দিন পরের ঘটনা। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কুরাইশেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মদীনা থেকে বের করে দেবার জন্য নানাবিধ অপচেষ্টা চালায়। যেমনভাবে তারা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের সেখান থেকে বের করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছিল ।

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরোক্ষ কারণ :

১. মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকটে কুরায়েশ নেতাদের পত্র প্রেরণ। সে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসূলের আগমনের কারণে তার ইয়াসরিবের নেতৃত্ব লাভের মোক্ষম সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় সে ছিল দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। রাসূলের প্রতি তার এই ক্ষোভটাকেই কুরায়েশরা কাজে লাগায় এবং নিম্নোক্ত কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়ে তার নিকটে চিঠি পাঠায়-

‘তোমরা আমাদের লোকটিকে (মুহাম্মাদকে) আশ্রয় দিয়েছ। এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, হয় তোমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ও তাকে বের

করে দিবে অথবা আমরা তোমাদের উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলা করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব ও মহিলাদের হালাল করে নেব'। এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দ্রুত তার সমমনাদের সাথে গোপনে বৈঠকে বসে গেল। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে গিয়ে বলেন, أتريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم 'তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের সাথে (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে) যুদ্ধ করতে চাও'? রাসূলের মুখে এ বক্তব্য শুনে বৈঠক ভেঙ্গে গেল ও দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।

২. আওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) ওমরাহ করার জন্য মক্কায় যান ও কুরায়েশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের অতিথি হন। উমাইয়ার ব্যবস্থাপনায় দুপুরে নিরিবিলি ত্বাওয়াফ করতে দেখে আবু জাহল তাকে ধমকের সুরে বলে, তোমাকে দেখছি মক্কায় বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করছ। অথচ তোমরা বেদ্বীনগুলোকে আশ্রয় দিয়েছ! ... আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবু ছাফওয়ানের (উমাইয়া বিন খালাফের) সাথে না থাকতে, তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না'। একথা শুনে সা'দ চীৎকার দিয়ে বলে ওঠেন, তুমি আমাকে এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার জন্য এর চেয়ে কঠিন বাধা হয়ে দাড়াবো- আর সেটা হ'ল মদীনা হয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের রাস্তা বন্ধ হবে'।

৩. কুরায়েশ নেতারা ইহুদীদের সাথে গোপনে আঁতাত করলো। অতঃপর মুহাজিরগণের নিকটে হুমকি পাঠালো এই মর্মে যে, 'মক্কা থেকে তোমরা নিরাপদে ইয়াসরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড়ো না। ওখানে গিয়েই আমরা তোমাদের ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখি'। তাদের এই হুমকি কেবল ফাঁকা বুলি ছিল না। বরং তারা হর-হামেশা তৎপর ছিল মুহাজিরগণের সর্বনাশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতেন না।

- **বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ :**

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিরিয়া ফেরত মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও তাদের পুরা খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ও সাঈদ বিন যায়েদকে প্রেরণ করেন। তারা 'হাওরা' নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ানের

নেতৃত্বে বিরাট এক ব্যবসায়ী কাফেলা সত্বর ঐ স্থান অতিক্রম করবে; যাতে রয়েছে এক হাযার উট বোঝাই কমপক্ষে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রার মাল-সম্পদ এবং তাদের প্রহরায় রয়েছে আমর ইবনুল আছ সহ মাত্র ৪০ জন সশস্ত্র জোয়ান। উল্লেখ্য যে, এই বাণিজ্যে মক্কার সকল নারী-পুরুষ অংশীদার ছিল। তারা দ্রুত মদীনায় ফিরে এসে রাসূলকে এই খবর দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চিন্তা করলেন যে, এই বিপুল মাল-সম্পদ মক্কায় পৌঁছে গেলে তার প্রায় সবই ব্যবহার করা হবে মদীনায় মুহাজিরগণকে ধ্বংস করার কাজে। অতএব আর মোটেই কালক্ষেপন না করে তখনই বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন ওই কাফেলাকে আটকানোর জন্য।

- **বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা**

এরপর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী কুরায়েশ পক্ষ মুসলিম পক্ষের বীরযোদ্ধাদের দ্বৈতযুদ্ধে আহবান করল। তাদের একই পরিবারের তিনজন সেরা অশ্বারোহী বীর উৎবা ও শায়বাহ বিন রাবী'আহ এবং অলীদ বিন উৎবা এগিয়ে এল। জবাবে মুসলিম পক্ষ হ'তে মু'আয ও মু'আবিবয বিন আফরা কিশোর দুই ভাই ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা তিনজন আনছার তরুণ যুবক বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কুরায়েশ পক্ষ বলে উঠলো হে মুহাম্মাদ! আমাদের স্বগোত্রীয় সমকক্ষদের পাঠাও'। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে ওবায়দাহ, হে হামযাহ, হে আলী তোমরা যাও। অতঃপর আলী তার প্রতিপক্ষ অলীদ বিন উৎবাহকে, হামযাহ তার প্রতিপক্ষ শায়বাহ বিন রাবী'আহকে এক নিমিষেই খতম করে ফেললেন। ওদিকে বৃদ্ধ ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তার প্রতিপক্ষ উৎবা বিন রাবী'আহর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হ'লেন। তখন আলী ও হামযাহ তার সাহায্যে এগিয়ে এসে উৎবাহকে শেষ করে দেন ও ওবায়দাহকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় ফেরার পথে ৪র্থ বা ৫ম দিন ওবায়দাহ শাহাদাত বরণ করেন।

প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীরযোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরায়েশ পক্ষ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময় আল্লাহর রাসূল (সা) আল্লাহর নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ’লে আজকের দিনের পরে তোমার ইবাদত করার মত কেউ আর ভূপৃষ্ঠে থাকবে না’। তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে তার চাদর উঠিয়ে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে রাসূল! যথেষ্ট হয়েছে, আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন’। এ সময় আয়াত নাযিল হল- ‘যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো‘আ কবুল করলেন। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা হবে ধারাবাহিক ভাবে অবতরণকারী’। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, আবুবকর! সুসংবাদ নাও। আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

মুসলিম বাহিনীর এই হামলার প্রচন্ডতার সাথে সাথে যোগ হয় ফেরেশতাগণের হামলা। ইকরিমা বিন আবু জাহল বলেন, ঐদিন আমাদের লোকদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেতো, অথচ দেখা যেতো না কে মারলো। আবু দাঊদ আল-মাযেনী বলেন, আমি একজন মুশরিক সৈন্যকে মারতে উদ্যত হব। ইতিমধ্যে তার ছিন্ন মস্তক আমার সামনে এসে পড়ল। আমি বুঝতেই পারলাম না, কে ওকে মারল’। রাসূলের চাচা আববাস যিনি বাহ্যিকভাবে মুশরিক বাহিনীতে ছিলেন, জনৈক আনছার তাকে বন্দী করে আনলে, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। বরং যে ব্যক্তি বন্দী করেছে, তাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি একজন চুল বিহীন মাথাওয়ালা ও সুন্দর চেহারার মানুষ এবং বিচিত্র বর্ণের একটি সুন্দর ঘোড়ায় তিনি সওয়ার ছিলেন। আনছার বললেন, হে রাসূল! আমিই এনাকে বন্দী করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত আনছারকে বললেন, চুপ কর। আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন’।

মুসলিম বাহিনীর দুর্ধর্ষ আক্রমনে মুশরিক বাহিনী প্রাণভয়ে পালাতে থাকল। এ দৃশ্য দেখে তাদের ধরে রাখার জন্য আবু জাহল তার লোকদের উদ্দেশ্যে জোরালো ভাষণ দিয়ে বলে উঠলো, সোরাক্বার পলায়নে তোমরা ভেঙ্গে পড়ো না। সে আগে থেকেই মুহাম্মাদের চর ছিল। ওৎবা, শায়বা, ওয়ালীদের মৃত্যুতেও ভীত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তাড়াহুড়োর মধ্যে তারা মারা পড়েছেন। লাত ও উযযার শপথ করে বলছি, ওদেরকে শক্ত করে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। অতএব তোমরা ওদেরকে মেরো না। বরং ধরো এবং বেঁধে ফেল'।

কিন্তু আবু জাহলের এই তর্জন-গর্জন অসার প্রমাণিত হ'ল। আনছারদের বানু সালামাহ গোত্রের কিশোর দু'ভাই মু'আয ও মু'আউভিয বিন 'আফরা তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং মু'আয প্রথম আঘাতেই আবু জাহলের পা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এ সময় তার কাঁধে ইকরিমা বিন আবু জাহলের তরবারির আঘাতে মু'আযের একটি হাত কেটে ঝুলতে থাকলে সে নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে এক টানে সেটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ছোট ভাই মু'আউভিযের আঘাতে আবু জাহল ধরাশায়ী হ'লে তারা উভয়ে রাসূলের কাছে এসে গর্বভরে বলে উঠলো হে রাসূল! আবু জাহলকে আমি হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ কি? তারা বলল, না। তারপর উভয়ের তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كلاكما قتله 'তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ'। অবশ্য এই যুদ্ধে মু'আউভিয বিন আফরা পরে শহীদ হন এবং মু'আয বিন আফরা হযরত উসমানের খেলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ গিয়ে দেখেন আবু জাহলের তখনও নিঃশ্বাস চলছে। তিনি তার দাড়ি ধরে মাথা কেটে নেবার জন্য ঘাড়ে পা রাখলে সে বলে ওঠে, রে বকরীর রাখাল, তুই এতদূর বেড়ে গিয়েছিস? উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মক্কায় বকরীর রাখাল ছিলেন। তারপর বলল, ওহ্! আমাকে যদি (মদীনার) ঐ চাষারা হত্যা না করে অন্য কেউ হত্যা করতো! এভাবে মক্কার বড় ত্বাগূতটা শেষ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তার মৃতদেহ দেখার পর বলেন, 'আল্লাহ আফরার দুই পুত্রের উপর

রহম করুন! তারা এই উম্মতের ফেরাঊনকে হত্যায় অংশীদার ছিল। অন্য অংশীদার ছিলেন ফেরেশতা এবং ইবনু মাসঊদ’।

- **যুদ্ধের ফলাফল**

এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৬জন মুহাজির ও ৮ জন আনছার শহীদ হন। কাফের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হয়। তাদের বড় বড় ২৪ জন নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূপে (القليب) নিক্ষেপ করা হয়। তাদের মধ্যে হিজরতের প্রাক্কালে মক্কায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী আবু জাহল সহ ১৪ নেতার ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিনজন আবু সুফিয়ান, জুবায়ের বিন মুতব‘ইম ও হাকীম বিন হেযাম পরে মুসলমান হন।

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বদরে তিনদিন অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সব মাল তার নিকটে জমা করতে বলেন। অতঃপর বদর থেকে রওয়ানা দিয়ে ছাফরা (الصفراء) গিরি সংকট অতিক্রম করে একটি টিলার উপরে গিয়ে বিশ্রাম করেন এবং সেখানে বসে গনীমতের সমস্ত মালের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল সৈন্যদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেন।

রাসূল (সা)- এর আগমনের একদিন পরে বন্দীদের কাফেলা মদীনায় পৌছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের আদেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয় এবং সাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান। কেননা ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য। অতঃপর তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন। কেননা এর ফলে কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের হেদায়াত নছীব করতে পারেন এবং তারা আমাদের জন্য সাহায্যকারী হ’তে পারে। কিন্তু উমর ফারূক (রাঃ) স্ব স্ব আত্মীয়কে স্ব স্ব হস্তে হত্যা করার পরামর্শ দেন। দয়ার নবী আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং অধিকাংশ বন্দীকে রক্তমূল্য নিয়ে ছেড়ে দেন। আবুল ‘আছ

সহ কয়েকজনকে রক্তমূল্য ছাড়াই মুক্তি দেন। আবুল ‘আস ছিল খাদীজার সহোদর বোনের ছেলে এবং রাসূল কন্যা যয়নবের স্বামী। কয়েকজনকে মাথা প্রতি ১০ জনকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মদীনাতেই রেখে দেন। তাদের মেয়াদ ছিল উত্তম রূপে পড়া ও লেখা শিক্ষা দান করা পর্যন্ত। এর দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রতি রাসূলের আকুল আগ্রহের প্রমাণ মেলে। যা কোন যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ইতিহাসে নযীর বিহীন।

উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আবু জাহেলসহ কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করলেন তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করল। দায়িত্ব পেয়ে রাসূল (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র ও জনবলসহ সে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের নিকট তাবু স্থাপন করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে মদ্বীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যুবকরাও এবার নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে। যারা বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরাবা বিন আওয়াস। আর যাদেরকে জিহাদ করতে সক্ষম মনে করেছেন, তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সামুরা বিন জুন্দুব এবং রাফে বিন খাদীজ। এদের বয়স ছিল তখন ১৫ বছর। কেউ কেউ বলেছেন- যাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন ১৫ বছর বয়স হওয়ার কারণে তাদেরকে বালেগ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। আর যাদের বয়স এর কম ছিল নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

অন্য একদল আলেম বলেন- ১৫ বছর বয়স বা বালেগ হওয়ার কারণে নয়; বরং যাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত শক্তি দেখেছেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদেরকে

ফেরত দিয়েছিলেন শক্তি না থাকার কারণেই তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীছের কতক শব্দে এসেছে যে, রাসূল (সা) যখন আমাকে শক্তিশালী দেখলেন তখন জিহাদের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক নবী (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি মদ্বীনা থেকে বের হয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করবেন? না মদিনায় থেকেই যুদ্ধ করবেন? রাসূল (সা)-এর রায় ছিল যে, মুসলমানেরা মদিনা থেকে বের হবেনা; বরং মদিনার ভিতরেই থাকবে। কাফেররা যদি মদিনায় প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করে তাহলে মুসলমানেরা মদিনার প্রবেশ পথে যুদ্ধ করবে এবং মহিলারাও ঘরের ছাদ থেকে কাফেরদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই মতকেই সমর্থন করল। আর এটিই ছিল সঠিক রায়। কিন্তু যে সমস্ত সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদ্বীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে পড়লেন। যারা বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবার তাদের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ল। তখন তারা বলল- আমরা আল্লাহর রসূলকে বের হতে বাধ্য করলাম! তারা আরও বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি মদিনায় অবস্থান করতে চান তাহলে তাই করুন। রাসূল (সা) তখন বললেন- যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর কোন নাবীর জন্য এটা জায়েয নয় যে, তাঁর মাঝে এবং শত্রুর মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলবে।

তাই নবী (সা) এক হাজার সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদিনায় অবশিষ্ট মুসলমানদের ইমাম নিযুক্ত করলেন। এর আগে মদিনায় থাকার সময় রাসূল (সা) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর তলোয়ারটি সামান্য ভেঙ্গে গেছে, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন- তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পরিবারের একজন লোক আক্রান্ত হবেন, গাভী যবেহ করার

ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিহত হবেন আর সুরক্ষিত দূর্গ হচ্ছে মদিনা।

তিনি পবিত্র জুআর দিন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মদিনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে এসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল।

অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ বাহিনীর উপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। এমন কি তারা যদি দেখে পাখীরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই বাহিনীকে পিছনে নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে মুশরিকরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

ঐ দিকে কুরাইশরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে ছিল দুইশত অশ্বারোহী যোদ্ধা। দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। আল্লাহর দুশমনেরা পরাজিত হল। তারা পরাজিত হয়ে তাদের মহিলাদের নিকট আশ্রয় নিতে লাগল। ঐ দিকে রাসূল (সা) কর্তৃক নিয়োজিত ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী যখন কাফেরদের পরাজয় দেখল তখন তারা রাসূল (সা) এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করতে লাগল এবং গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল।

তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রসূল (সা) এর আদেশের কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলনা। তাদের ধারণা ছিল মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সুতরাং রাসূল (সা) এর আদেশের কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। তাই তারা স্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐ দিকে মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পিছন দিক খালি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। এখানে ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা পলায়ন করলে মুশরিকরা রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুশরিকরা তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

এ সময় শয়তান উচ্চস্বরে চিৎকার করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই কথা শুনে মুসলিমগণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। আনাস বিন নযর তখন মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?। তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দ! আমি উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূল (সা) মুসলমানদের সামনে আগমণ করলেন। কাব বিন মালেকই সর্বপ্রথম তাঁকে হিলমেটের নীচ থেকে চিনে ফেললেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হে মুসলিমগণ! এই তো আল্লাহর রসূল এসে গেছেন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূল (সা) ইংগিতের মাধ্যমে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তাঁর চতুর্পাশে এসে একত্রিত হল। সেখানে আবু বকর, উমার এবং আলী (রাঃ) ও ছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ হল, ইহুদীরা যখন দেখল যে, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা জয়লাভ করেছে ও মুসলিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং তারা শুনতে পেল যে, আগামী বছর আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তরে মুসলিমদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করবে, তখন তাদের সাহস বেড়ে গেল। সুতরাং ইহুদী নেতারা মক্কার কুরাইশদের কাছে গমণ করল। তারা মক্কায় গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল এবং রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে তারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করল। ইহুদীদের আগ্রহ দেখে কুরাইশদের হিম্মত ও সাহস বেড়ে গেল। ইহুদীদের পরামর্শ মুতাবেক তারা রণপ্রস্তুতি নিতে শুরু করল। এ লক্ষ্যে তারা গাতফান এবং অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট গমণ করল। তারা তাদেরকে মুহাম্মাদ (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানাল। তারা সেই ডাকে সাড়া প্রদান করল।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন আরব গোত্রের ১০ হাজার স্বশস্ত্র যোদ্ধা প্রস্তুত হয়ে গেল। এদের মধ্যে কিছু ইহুদীও ছিল। আবু সুফিয়ান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করল। পূর্ণ প্রস্তুতি সহ তারা মদিনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

সংবাদ পেয়ে নবী (সা) সালমান ফারসীর পরামর্শে মদিনার চার পার্শে খন্দক তথা পরীখা খননের পর তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনার মূল শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় ইহুদী গোত্রগুলোও চুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে মিলিত হল এবং মুনাফিকদের নিফাকীও প্রকাশিত হয়ে গেল। এতে মুসলিমদের উপর বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়ল এবং অনেক লোকই ভীত হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যেই কুরাইশ বাহিনী মদিনার নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং চতুর্দিক থেকে মদিনাকে ঘেরাও করে ফেলল। পূর্ণ একমাস তারা কঠোরভাবে মদিনাকে অবরোধ করে রাখল। মুশরিক ও মুসলিম শিবিরের মাঝখানে খন্দক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কোন প্রকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উপর বিরাট এক

বাতাস প্রেরণ করলেন। প্রচন্ড বাতাসে তাদের তাবুগুলো উল্টে গেল। এতে করে তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি প্রবেশ করল। তারা আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি নিয়ে ফেরত গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৈনিকদেরকে বিজয় দান করলেন এবং দুশমনদেরকে একাই পরাজিত করলেন।

উহুদের অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলিমগণের সুখ্যাতি ও শক্তি সামর্থ্যের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। এতে তাঁদের মনোবলের জোয়ার ধারায় কিছুটা ভাটার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এর ফলে বিরুদ্ধবাদীগণের অন্তর থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলিম ভীতি হ্রাস পেতে থাকে। মূল কথা হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের একের পর এক নানা বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু নবী কারীম (সাঃ) তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা প্রসূত পরিচালনার মাধ্যমে সকল প্রকার চক্রান্ত ও বৈরিতা অতিক্রম করে পুনরায় গৌরব ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে মুসলিমগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুরোপুরি সক্ষম হন। কারণ, এ পদক্ষেপ এতই গুরুত্ব ও বীরত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ফলে প্রতিপক্ষগণ, অর্থাৎ মুশরিক, মুনাফিক্ব ও ইহুদীগণ একদম স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলে কারীম (সাঃ) আরও এমন সব সামারিক পদক্ষেপ অবলম্বন করেছিলেন যা শুধু মুসলিমগণের হৃতগৌরব পুন: প্রতিষ্ঠায় সাহায্যই করে নি, বরং তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতেও প্রভূত সাহায্য করেছিল।

রা'যীর ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযাল' এবং 'ক্বারাহ' গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করে যে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ইসলামের চর্চা রয়েছে। কাজেই, কুরআন ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্য তাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে পাঠালে ভাল হয়। সে মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইতিহাসবিদ ইবনু

ইসহাক্বের মতে ছয় জন এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে দশ জন সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। ইবনে ইসহাক্বের মতে মুরশেদ বিন আবূ মুরশেদ গানাভীকে এবং সহীহুল বুখারীর বর্ণনা মতে ‘আসিম বিন উমার বিন খাত্তাবের নানা ‘আসিম বিন সাবেতকে এ দলের নেতৃত্বে প্রদান করা হয়। এরা যখন রাবেগ এবং জেদ্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোযাইল গোত্রের ‘রাযী’ নামক ঝর্ণার নিকটে পৌঁছান তখন আযাল এবং ক্বারাহর উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ হুযাইল গোত্রের শাখা বানু লাহয়ানকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়।

এ গোত্রের একশত তীরন্দাজ তাঁদের অনুসন্ধান করতে থাকে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে তাদের পেয়ে যায়। সাহাবাগণ একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বনু লাহয়ান তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পর বলতে থাকে, ‘তোমাদের সঙ্গে এ মর্মে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে তোমরা যদি নীচে নেমে আস তাহলে আমরা কাউকেও হত্যা করব না। ‘আসিম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন শাহাদতবরণ করেন। জীবত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খুবাইব (রাঃ), যায়দ বিন দাসিন্নাহ (রাঃ) এবং আরও একজন। আবারও বনু লাহয়ান তাদের ওয়াদা পুনর্ব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে ধনুকের ছিলা দ্বারা তাঁদের বেঁধে ফেলে। অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃতীয় সাহাবী তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। তারা তাঁকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব (রাঃ) এবং যায়দ বিন দাসিন্নাহকে (রাঃ) মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করেছিলেন।

খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, ‘দু’ রাকআত সালাত পড়ার জন্য সময়

ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন, (اللهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا)

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।

এ কথার পর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

অর্থ: আমার শত্রুগণ তাদের দলবল ও তাদের গোত্রসমূহকে আমার চারদিকে একত্রিত করেছে এবং তাদের সকলেই এক স্থানে একত্রিত হয়েছে।

তারা আমার হত্যার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য তাদের সন্তান-সন্ততি এবং নারীদেরকেও একত্রিত করেছে। আর আমাকে হত্যা করার জন্য প্রকান্ড ও সুদৃঢ় এক খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

অর্থঃ হে আরশের মালিক (আল্লাহ)! আমাকে হত্যার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তারা যা করতে চায় তুমি আমাকে তাতে ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দান কর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমার মাংসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষার নিরসন ঘটাবে।

আমাকে হত্যার পূর্বে কুফরী গ্রহণ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ তারা দিয়েছিল, কিন্তু কুফরী গ্রহণ না করে ধর্মের পথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি। তখন আমার নয়ন যুগল বিনা অস্থিরতায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে আমি অস্থির হই নি, বরং তাদের অন্যায় আচরণ ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে আমার নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়েছে।

لَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلٰى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي
وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلٰى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমি যখন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর পথে কাফিরদের হাতে নিহত হচ্ছি তখন আমার হত্যা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।

আমি জানি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার মৃত্যু হচ্ছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার শরীরের বিখন্ডীকৃত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই বরকত দান করতে পারেন।'

এরপর খুবাইব (রাঃ)-কে আবূ সুফইয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজনসহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটাই তো সহনীয় নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাঁটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'

এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু 'আমির বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল উক্ববাহ বিন হারিস। খুবাইব (রাঃ) তার পিতা হারিসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, খুবাইব (রাঃ) সর্বপ্রথম সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হত্যার মুহূর্তে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল, অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়দ বিন দাসিন্নাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরাইশগণ 'আসিম (রাঃ)-এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সনাক্ত করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ

প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমরুলের ঝাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দুরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। 'আসিম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। উমার যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।

বীরে মাউনাহর মর্মান্তিক ঘটনা

যে মাসে রাযী এর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বি'রে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযী'র ঘটনার চাইতেও কঠিন ও বেদনাদায়ক। এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবূ বারা' 'আমির বিন মালিক যিনি 'মুলায়েবুল আসিন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী কারীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম (সাঃ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে (রাঃ) নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, (إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ) 'নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি।' আবূ বারা' বললেন, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।'

এ কারণে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে ৪০ জন এবং সহীহুল বুখারীর তথ্য মোতাবেক ৭০ জন সাহাবাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সঙ্গে প্রেরণ। ৭০ জনের সংখ্যাটি সঠিক বলে প্রমাণিত। মুনযির বিন আমিরকে (বনু সায়েদা গোত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল এবং 'মু'নিক লিইয়ামূত' (মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন,

দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবাবৃন্দ (রাঃ) ছিলেন বিজ্ঞ, ক্কারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দন্ডায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ কূপটি বনু 'আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ (রাঃ) উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রসহ আল্লাহর শত্রু 'আমির বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, 'আল্লাহর মহান! কাবার প্রভূর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।'

এরপর পরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (রাঃ) আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহবান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবূ বারা'র আশ্রয়ে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহবানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সুলাইমকে আহবান জানাল। বুন সুলাইমের তিনটি গোত্র উমাউয়া, রে'ল এবং যাকওয়ান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। কেবলমাত্র কা'ব বিন যায়দ (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাছাড়া আরও দু'জন সাহাবী- 'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এবং মুনযির বিন উক্কবা বিন আমির (রাঃ) উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর মুনযির তাঁর বন্ধুগণের সংখ্যা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করেন। 'আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয়ে যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর

সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে- যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল- তাঁকে মুক্ত করে দেয়।

‘আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এ বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদাত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

‘আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) প্রত্যাবর্তন কালে কানাত উপত্যাকার প্রান্তভাবে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করেন। বনু কিলাব গোত্রের দু’ ব্যক্তিও তথায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা উভয়েই যখন ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন ‘আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদের হত্যা করে তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অথচ তাদের দু’ জনের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু ‘আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তা জানতেন না। কাজেই, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করেন তখন তিনি বললেন যে, (لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيْلَيْنِ لَأَدِيَنَّهُمَا) ‘তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে করতে হবে।’ এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিম এবং তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের নিকট থেকে শোনিত পাতের খেসারত একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই পরিণামে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

মা’উনাহ এবং রাযী’র উল্লেখিত বেদনা-দায়ক ঘটনাবলীতে যা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এতই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এ পরিমাণ চিন্তিত ও মর্মাহত হন যে, যে সকল গোত্র ও সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা ক’রে সাহাবীগণকে (রাঃ) হত্যা করে নাবী কারীম (সাঃ) এক মাস যাবৎ তাদের বিরুদ্ধে

আল্লাহর সমীপে বদ দু'আ করতে থাকেন। তিনি ফজরের সালাতে রে'ল যেকওয়ান, লাহইয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্-দোয়া করেন এবং বললেন যে, (عُصَيَّةُ عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ) 'উসাইয়া আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী করেছে।'

আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে স্বীয় নাবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তী কালে মানসুখ হয়ে যায়। সেই আয়াত ছিল এইরূপ- (بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ) 'আমার সম্প্রদায়কে এ কথা বলে দাও যে, আমরা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমারও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুনুত পাঠ করা ছেড়ে দেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নবী (সা) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রথমে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্য একজন গোয়েন্দা মক্কায় পাঠালেন। উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা যুদ্ধের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাকে কাবার কাছেই পৌঁছতে দিবেনা এবং তাঁর সাথে তারা প্রচন্ড লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। নবী (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শে বসলেন। আবু বকর (রাঃ) এর পরামর্শ ছিল, কুরাইশদেরকে কোন প্রকার ছাড় দেয়া যাবেনা। তারা যদি রাস্তায় আটকিয়ে দেয়, তাহলে প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। রাসূল (সা) আবু বকরের এই মতকেই পছন্দ করলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নবী (সা) উসমান (রাঃ) কে এই খবর দেয়ার জন্য মক্কায় পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য মক্কায় আসছি না। উমরাহ পালন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কুরাইশরা এই কথার মোটেই মূল্যায়ন করলনা। তারা বলল- আমরা তোমার কথা শুনলাম। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা সামনে

অগ্রসর হচ্ছিল। এক পর্যায়ে সন্ধির পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। উভয় পক্ষের লোকেরা পরস্পর তীর ও পাথর নিক্ষেপে লিপ্ত হল। এই পর্যায়ে নবী (সা) এর কাছে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশরা উসমান (রাঃ) কে হত্যা করে ফেলেছে। মুসলমানেরা এই খবর শুনে রাগান্বিত হলেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। তারা একটি গাছের নীচে একত্রিত হয়ে রাসূল (সা) এর হাতে এই মর্মে বায়আত নিলেন যে, তারা যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং কোনক্রমেই এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ না নিয়ে মদিনায় ফেরত যাবেন না। কিন্তু একটু পরেই সহীহ-সালামতে উসমান (রাঃ) মক্কা হতে ফেরত আসলেন। উসমান (রাঃ) এর আগমণে পরিস্থিতি শান্ত হল। পুনরায় নতুন করে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল। আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে নিম্নে বর্ণিত শর্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি চুক্তি রচিত হল। ইসলামের ইতিহাসে এটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত।

খায়বারের যুদ্ধ

মুসা বিন উকবা বলেন- হুদায়বিয়া থেকে ফেরত এসে নবী (সা) ২০ দিন বা এর চেয়ে কম সময় মদিনায় অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় তিনি সিবা বিন উরফুযাকে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। এ সময় আবু হুরায়রা (রাঃ) মদিনায় আগমণ করে ফজরের সলাতে সিবা বিন উরফুযার সাথে সাক্ষাত করলেন। সিবা বিন উরফুযাকে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুতাফফিফীন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। তিনি সলাতেই বলতে শুরু করলেন। উমুক ব্যক্তির জন্য সর্বনাশ হোক! তার নিকট রয়েছে দু’টি দাঁড়িপাল্লা। সে যখন মানুষকে কোন কিছু মেপে দেয়, তখন ছোট পাল্লা দিয়ে মেপে দেয়। আর যখন মেপে নেয় তখন বড়টি দিয়ে নেয়। সলাত শেষে তিনি সিবা-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) খায়বারে গিয়ে নবী (সা)-এর সাথে মিলিত হলেন। নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলায় তারা আবু হুরায়রা

ও তাঁর সাথীদেরকে মালে গণীমতের অংশ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং তিনিও গণীমতের অংশ পেলেন।

নবী (সা) খায়বারে গিয়ে ফজরের সলাত পড়লেন। সলাতের পর মুসলমানগণ আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নাবী (সা) এর আক্রমণের খবর যেহেতু তাদের জানা ছিল না, তাই তারা সকাল বেলা তাদের চাষাবাদের জমির দিকে বের হচ্ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখে বলল- আল্লাহর শপথ! এই তো মুহাম্মাদ এবং তাঁর বাহিনী এসে গেছে। এই বলে তারা নিজেদের দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। নবী (সা) তখন বললেন- আল্লাহু আকবার! খায়বার বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন সকাল বেলা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।

অতঃপর নবী (সা) আলীকে যুদ্ধের পতাকা দিলেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর লেখক মারহাব নামক ইহুদীর সাথে আলী (রাঃ) এর লড়াইয়ের বর্ণনা এবং আমের বিন আকওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় আলী (রাঃ) মারহাবকে হত্যা করেছেন।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী খায়বারবাসীদেরকে ঘেরাও করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলিমগণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় যখন তারা খাওয়ার জন্য গৃহপালিত গাধা যবেহ করল তখন রাসূল (সা) তাদেরকে গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করলেন।

পরিশেষে তাদের সাথে এই শর্তে মীমাংসার চুক্তি করলেন যে, তারা খায়বার ছেড়ে চলে যাবে এবং যুদ্ধের হাতিয়ার ব্যতীত যত ইচ্ছা সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য রাসূল (সা) এর জন্য রেখে যেতে হবে। আর শর্ত করা হল যে, কেউ যদি কোন কিছু গোপন করে কিংবা লুকিয়ে ফেলে, তবে তার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি কার্যকর হবেনা। অতঃপর তারা একটি মশক (কলসী) লুকিয়ে ফেলল। তাতে হুআই বিন আখতাবের সম্পদ লুকায়িত ছিল। বনী নযীর কবীলাকে উচ্ছেদ করার সময় সে

তা খায়বারে নিয়ে এসেছিল। নবী (সা) হুআই বিন আখতাবের চাচাকে মশকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল- যুদ্ধ এবং অন্যান্য খরচে তা শেষ হয়ে গেছে। নবী (সা) বললেন- দিন তো বেশী হয়নি। সম্পদ ছিল বিপুল পরিমাণ। এত দ্রুত সম্পদগুলো শেষ হয়ে গেল কিভাবে? অতঃপর নবী (সা) হুআইয়ের চাচার খোঁজ-খবর রাখার জন্য যুবাইর (রাঃ) কে নিযুক্ত করে দিলেন। যুবাইর (রাঃ) যখন তার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন, তখন সে বলল- আমি হুআইকে এই অঞ্চলের বিরানভূমির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। সাহাবীগণ সেখানে গিয়ে তালাশ করে তা পেয়ে গেলেন।

অতঃপর রাসূল (সা) যখন উপরোক্ত শর্তে তাদেরকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করলেন, তখন তারা বলল- এই শর্তে আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের যমীন চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নিব আর আপনি বাকী অর্ধেক নিবেন।

ঐ দিকে রাসূল (সা) এর কাছে কাজ করার মত কোন লোক ছিলনা। তাই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। ইহুদীরা খায়বারে কত দিন থাকতে পারবে? চুক্তিতে এটি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ ছিলনা; বরং বিষয়টি রাসূল (সা) এর ইচ্ছার উপর দেয়া হয়েছিল। যত দিন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দিবেন।

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তিনি তাদের কাউকেই হত্যা করেন নি। তবে চুক্তি ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করলেন। তাদের একজন ছিল হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়ার স্বামী।

রাসূল (সা) সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্দী করলেন। তিনি আবুল হুকাইকের এক পুত্রের বিবাহধীন ছিলেন। নবী (সা) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করলেন। মুক্ত করে দেয়াটাই বিয়ের মোহরানা নির্ধারণ করলেন।

খায়বারের ভূমিকে রাসূল (সা) ৩৬ ভাগে বিভক্ত করলেন। প্রত্যেক ভাগকে আবার ১০০ ভাগে ভাগ করে মোট ৩৬০০ অংশে ভাগ করলেন। এখান থেকে রাসূল (সা)

এবং মুসলমানগণ অর্ধেক অর্থাৎ ১৮০০ অংশ নিলেন। আর বাকী অংশগুলো তথা ১৮০০ অংশ সেখানকার যমীন দেখা-শুনাকারী এবং বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য রেখে দিলেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন- খায়বারের যমীন মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার কারণ হল সেখানকার এক অংশ জয় করা হয়েছিল যুদ্ধ করে আরেক অংশ জয় করা হয়েছিল সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে। যেই অংশ লড়াইয়ের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল, তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। আর যেই অংশ চুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, তা খায়বারের যমীন দেখা-শুনাকারীদের জন্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে রেখে দেয়া হয়েছিল।

তবে সঠিক কথা হচ্ছে খায়বারের সকল অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছিল। এটিই সঠিক ও সন্দেহাতীত কথা।

কাযা উমরাহ

ইমাম হাকিম বলেছেন, এ সংবাদ ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রমাণিত যে, যখন যুল ক্বা'দাহর চাঁদ দেখা গিয়েছিল, তখন নবী কারীম (সাঃ) সাহাবাবৃন্দের (রাঃ) প্রত্যেককেই ক্বাযা হিসেবে নিজ নিজ উমরাহ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। যাঁরা হুদায়বিয়াহয় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই উমরাহ আদায়ে শরীক হবেন, কেউ পিছনে থাকবেন না। এ প্রেক্ষিতে (সে সময়) যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই যাত্রা করেন। হুদায়বিয়াহয় উপস্থিত ছিলেন না এমন কিছু সংখ্যক লোকও উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে বের হন। এভাবে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বহির্গত লোকের সংখ্যা ছিল দু' হাজার। মহিলা এবং শিশুরা ছিল এ সংখ্যার অধিক।

রাসূলে কারীম (সাঃ) এ সময়ে আবূ রুহম গিফারী (রাঃ)-কে মদীনায় তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ৬০টি উট এবং সে সব দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন নাজিয়া বিন জুন্দুব আসলামী (রাঃ)-কে। যুল হুলাইফাতে উমরাহর

জন্য ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়িক ধ্বনি উঁচু করলেন। নবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মুসলিমরাও লাব্বায়িক পড়লেন। মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কায় কাফেলার লোকজনদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। ইয়া'জুজ নামক উপত্যকায় পৌঁছার পর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ বর্ম, ঢাল, তরবারী, তীর, বর্শা সব কিছু রেখে দেয়া হল এবং ওগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য আওস বিন কাওলী আনসারী (রাঃ)-কে ২০০ লোকসহ নিযুক্ত করা হল। আরোহীগণ অস্ত্র ও খাপে রক্ষিত তরবারী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

মক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলিমগণ তরবারীগুলো কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বায়িক ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন।

মুশরিকরা মুসলিমগণের এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরে হয়ে এসে কা'বা গৃহের উত্তর দিকে অবস্থিত কু'আইক্বি'আন নামক পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিল এবং কথোপকথন সূত্রে তারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, 'তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে ইয়াসরিবের অর্থাৎ মদীনার জ্বর যাদের একদম নষ্ট করে দিয়েছে।' এ কারণে নবী কারীম (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, প্রথম তিনটি চক্কর যেন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করেন। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে। সাত চক্কর দৌঁড়ে পালন করার নির্দেশ শুধুমাত্র রহমত ও মমত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দেন নি, বরং উল্লেখিত নির্দেশ প্রদানের অভিপ্রায় এই ছিল যে, মুশরিকগণ নবী কারীম (সাঃ)-এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুক। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে ইযতিবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং গায়ের চাদর খানা ডান বগলের নীচ দিয়ে অতিক্রম করিয়ে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে তার দ্বিতীয় কোণটি বাম কাঁধের উপর নিয়ে নেয়া।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবীগণ দৌঁড় দিয়ে তিন চক্কর শেষ করলেন। তা প্রত্যক্ষ করে মুশরিকগণ বলতে থাকল, এ সকল লোকজন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাতো সঠিক নয় বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও অধিক শক্তিশালী। আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে নাবী কারীম (সাঃ) সাফা' ও মারওয়ার সা'ঈ করলেন। ঐ সময়ে নবী কারীম (সাঃ)-এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সা'ঈ শেষে বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটে পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুন্ডন করলেন। সাহাবাগণও (রাযি.) অনুরূপ করলেন। এরপর কিছু সংখ্যক লোককে ইয়াজেজ পাঠিয়ে দেয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল এরা সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুলোকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা উমরাহ পালন করবেন।

উল্লেখিত উমরাহ পালন কালে নবী কারীম (সাঃ) মায়মুনা বিনতে হারিস আমেরিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌঁছার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জা'ফার বিন আবূ ত্বালিবকে মায়মুনা (রাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত দায়দায়িত্ব আব্বাসকে সমর্পণ করেছিলেন। কারণ, মায়মুনার বোন উম্মুল ফযল ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আব্বাস (রাঃ) নবী কারীম (সাঃ)-এর সঙ্গে মায়মুনার বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় নবী (সাঃ) আবূ রা'ফেকে পিছনে রেখে যান যেন তিনি মায়মুনা (রাঃ)-কে সওয়ারীর উপর আরোহন করে তাঁর খিদমতে নিয়ে যান। যখন সারফ নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন নবী পত্নী মায়মুনা (রাঃ)-কে তাঁর খিদমতে পৌঁছে দেয়া হল।

উল্লেখিত উমরাহকে 'উমরায়ে ক্বাযা' এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তা উমরায়ে হুদায়বিয়াহর ক্বাযা হিসেবেই আদায় করা হয়েছিল।

মুতাহর যুদ্ধ

মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল ঊলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান। মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করার পর এবং হুদায়বিয়াতে প্রধান প্রতিপক্ষ কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতাহ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা উমার (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়।

যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের অত্র বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর ছিল প্রায় ২ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা (مُؤْتَةَ) নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর তিনজন সেনাপতি শহীদ হ'লে সকলের পরামর্শে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এই বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (সা) বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয়, তবে তার স্থলে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে নিহত হয়, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে। বস্তুতঃ এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম।

মুসলিম বাহিনী শামের মা'আন অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা হঠাৎ জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এসময় এক লাখ সৈন্য নিয়ে শামের বালক্বা অঞ্চলের মাআবে অবস্থান করছেন। সেখানে তার সাথে যোগ হয়েছে লাখাম, জুযাম, ক্বাইন, বাহরা ও বালী প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের আরো এক লাখ যোদ্ধা।

অভাবিতভাবে বিরোধী পক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অতঃপর পরামর্শ সভায় বসেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের মত। যেখানে পূর্ব থেকে কেউ জানতেন না যে, তারা এত বড় একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের সম্মুখীন হবেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকটে শত্রু সংখ্যার খবর দিয়ে পত্র লিখি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবেন অথবা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিবেন, তাই করব। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

'হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! তোমরা যেটাকে অপছন্দ কর, নিশ্চয় তোমরা সেটা অন্বেষণের জন্যই বের হয়েছ। আর তা হ'ল 'শাহাদাত'। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা সংখ্যা দ্বারা, শক্তি দ্বারা বা আধিক্য দ্বারা। আর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করিনা কেবলমাত্র এই দ্বীনের স্বার্থ ব্যতীত। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে বাড়ুন। নিশ্চয় এর মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি কল্যাণের একটি রয়েছে। হয় বিজয় নয় শাহাদাত। অতঃপর সকলে বললেন- অবশ্যই, আল্লাহর কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছেন'।

অতঃপর সকলে নতুন উদ্দীপনায় স্রেফ আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং দু'দিন পর যুদ্ধে রওয়ানা হন ও মুতা (مُؤْتَةُ) নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। অতঃপর তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে নেন। এসময় তাঁর ঘোড়া শাক্করা নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝান্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝান্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান। তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব, অভূতপূর্ব নিখাদ

শাহাদাতপ্রিয়তা, খালিদের অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় সাধিত হয়।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালিদ বিন ওয়ালীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল, তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল 'খন্দক' যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

মক্কা বিজয়

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান, ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা) মদীনা হতে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময় মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহুম কুলছূম বিন হোসায়েন আল-গেফারী। এটি ছিল একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর রাসূল (সা)-এর সত্যতার ব্যাপারে সমগ্র আরব বিশ্বে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বে কা'বাগৃহের উপর কর্তৃত্বের কারণে মানুষ কুরাইশ নেতাদের প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য পোষণ করত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল (সা) তাদের কারো প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাজার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল,

তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাজার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। টুঁ শব্দটি করার সাহস কারো হল না। নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী। কা'বাগৃহ হল মূর্তিশূন্য। 'উয্যার বদলে শুরু হল আল্লাহর জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস।

এরপর নবী কারীম (সাঃ) ভিতর থেকে কা'বাহ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল (রাঃ) ভিতরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান। এ অবস্থায় নবী কারীম (সাঃ)-এর বাম পাশে থাকে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি। ঐ সময়ে কা'বাহ ঘরটি ছিল ছয় স্তম্ভবিশিষ্ট। অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) সেখানেই সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশগুলো তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাকবীর ও একত্ববাদের আয়াতগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর কা'বা ঘরের দরজা খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কা'বাহ ঘরের সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিল। দরজার দু' অংশ ধারণ করে নিম্নভাগে দন্ডায়মান কুরাইশদের সম্বোধন করে নবী কারীম (সাঃ) বললেন,

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি একক ভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানো সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান, অথবা পূর্ণতা, অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দুই পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভুলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ)-এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি।'

এরপর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন-

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি এবং সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জ্ঞাত আছেন এবং সব খবর রাখেন। [আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। আলী (রাঃ) বলেছেন, 'যার হাতে চাবি ছিল তিনি নবীজী (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হুজুর! আমাদের জন্য হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানের সহিত কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মানও একই সঙ্গে প্রদান করুন।' আল্লাহ আপনার উপর রহম করুক। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক এ আরযটি আব্বাস (রাঃ) করেছিলেন। অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) বললেন, উসমান বিন ত্বালহাহ কোথায়? তাঁকে ডাকা হলে নবী কারীম (সাঃ) বললেন, উসমান! এ নাও তোমার চাবি। অদ্য পুণ্য এবং ওয়াদা পূরণের দিন। তাবাকাত ইবনু সা'দ (রাঃ)- এর বর্ণনায় আছে যে, চাবি দেয়ার সময় নবী কারীম (সাঃ) আরও বলেছিলেন,

'সর্বক্ষণের জন্যই তুমি এ চাবি গ্রহণ কর। তোমার নিকট থেকে এ চাবি সেই ছিনিয়ে নিবে যে অত্যাচারী হবে। উসমান! আল্লাহ নিজ ঘরের জন্য তোমাকে বিশ্বাসভাজন করেছেন। অতএব, আল্লাহর এ ঘরে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তুমি যা পাবে তা ভোগ করবে।'

হুনাইনের যুদ্ধ

ইবনে ইসহাক বলেন- হাওয়াযেন গোত্র যখন মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেল তখন মালেক বিন আওয়ফ হাওয়াযেন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করল। তার সাথে ছাকীফ, জুশাম এবং অন্যান্য গোত্রও এসে যোগ দিল। তাদের মধ্যে দুরাইদ বিন সিমতা নামক একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। এই বৃদ্ধের মতই কার্যকর হত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) এখানে হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি এই যুদ্ধের কতিপয় হিকমতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন মক্কা বিজয় হবে তখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে এবং সমস্ত আরব গোত্র রাসূল (সা) এর আনুগত্য করবে।

যখন মক্কা বিজয় পূর্ণ হল তখন হিকমতে ইলাহীর দাবী এই ছিল যে হাওয়াযেন এবং তাদের সহযোগী গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে। তাই তারা বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করে রাসূল (সা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছেন যে, তাঁর হুকুমই বিজয়ী হবে ও তাঁর রাসূল (সা) এর সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের থেকে অর্জিত মালে গণীমত মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বারগাহে ইলাহীতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম পরিণত হবে।

এই বার আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী এবং তাঁর বান্দাদেরকে এমন এক বিরাট শক্তির মাধ্যমে বিজয় দান করলেন, যা মুসলিমদের নিকট ইতিপূর্বে ছিলনা। উদ্দেশ্য হল, যাতে পরবর্তীতে অন্যান্য আরব শক্তি মুসলিমদের মুকাবেলা করতে ভয় পায়।

আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের দাবী এই ছিল যে, মুসলমানদের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকে তাদেরকে পরাজয়ের স্বাদ ভোগ করালেন।

এর মাধ্যমে তিনি ঐ সমস্ত মুসলিমদের মাথাকে নত করতে চেয়েছেন, যারা মক্কা বিজয়ের দিন অহংকারের সাথে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন এবং আল্লাহর রাসূল (সা) এর ন্যায় মস্তক অবনত করে হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাথে প্রবেশ করেনি

এবং যারা বলেছিল- সংখ্যা কম হওয়ার কারণে আজ আমরা পরাজিত হবনা। এটি বুঝানোও উদ্দেশ্য ছিল যে, সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হতেই আগমণ করে থাকে। রাসূল (সা) সেদিন স্বীয় মাথাকে এত নীচু করেছিলেন যে, তাঁর থুতনী বাহনের সাথে প্রায় মিশে যাচ্ছিল।

সুতরাং যখন মুসলমানদের মন ভেঙ্গে গেল, তখন তাদের মনে শান্তনা দেয়ার জন্য ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) এবং মুমিনদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলার হিকমতের আরও দাবী এই যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পোশাক কেবল বিনয়ীদের উপরই অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

"পৃথিবীতে যাদেরকে দুর্বল বিবেচনা করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে যমীনের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত"।

বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং হুনাইনের যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এই উভয় যুদ্ধেই ফিরিস্তাগণ মুসলমানদের পক্ষে স্বশরীরে যুদ্ধ করেছেন। উভয়টিতেই নবী (সা) শত্রুদেরকে লক্ষ্য করে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এই উভয় যুদ্ধেই আরবদের হিংসার আগুন নির্বাপিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে পড়েছিল এবং তাদের তেজ কমে গিয়েছিল। আর হুনাইন যুদ্ধ তাদের শক্তিকে খর্ব করে দিয়েছে।

তাবুক যুদ্ধ

তাবুক যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনের শেষ যুদ্ধ । এই যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এমন একটি কঠিন পরীক্ষা যা দ্বারা ঈমানদার ও অন্যান্যদের মধ্যে বিভেদের একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাবুক স্থানটি ছিল মদিনা থেকে ৬৮০-৬৯০ কিলোমিটার দূরে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি আরব গোত্রের বাসস্থান। মক্কা বিজয়ের পর মানুষ যখন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিজেকে নিরাপদ বোধ করে সে অবস্থায় কিছু মুনাফিক রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মদিনা আক্রমণের প্ররোচনা দিতে থাকে তাছাড়া স্থানীয় সমস্ত আরব গোত্র যখন ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে সে সময় দূরবর্তী তাবুকের এই আরব গোত্র এ মুসলিমদের নানাভাবে ত্যক্ত বিরক্ত করে চলছিল। তাই মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাবুক অভিযান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

- **যুদ্ধের মূল কারণ**

সে সময় পৃথিবীতে কয়েকটি শক্তি পৃথিবী শাসন করছিল তার মধ্যে রোমানরা অন্যতম। পূর্ববর্তীতে নবী কারীম (সা) এর দূত হত্যা কে কেন্দ্র করে রাসুলুল্লাহ (সা) জায়েদ বিন হারিশার নেতৃত্বে মুতাহ নামক স্থানে রোমক বাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যদিও লক্ষ লক্ষ রোমান সেনার বিরুদ্ধে কয়েক হাজার মুসলিম সেনা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে কৌশলগতভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল । তখন রোমানরা আর নতুন করে আক্রমণ করতে সাহস পেয়েছিল না। এখন আরবে অবস্থিত কিছু মুনাফিক রোমানদের প্ররোচনা দিতে থাকে মদিনা আক্রমণের ব্যাপারে। সমস্ত আরব গোত্রের উপর মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রোমানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ।তাই এই মুসলিম সাম্রাজ্যকে যেন ভবিষ্যতে বাড়তে দেওয়া না যায় তার জন্য তারা মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

এদিকে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে ৪০ হাজার সৈন্যর একটা বিরাট দল মুসলিমদের আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয় এ খবর মদিনায় আসার পর মুসলিমদের

মধ্যে প্রাথমিকভাবে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মদিনার মুনাফিকরা এমনভাবে এই ঘটনাটিকে উপস্থাপন করা শুরু করে যা মুসলিমদের মধ্যে চিন্তা চেতনা বাড়িয়ে তোলে। এদিকে খবর আসতে থাকে নিজ পতাকার আওতায় খ্রিস্টান গোত্র সমূহের মধ্যে লাখো জুজান ও অন্যান্য গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে তাদের বাহিনী গঠন করতে শুরু করে।

- **মুসলিমদের যুদ্ধ প্রস্তুতি**

রাসুলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে মুসলিমরা যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে । সময়টা ছিল প্রচন্ড গরম এবং তখন বাগবাগিচায় ফলমূল সংগ্রহ করার সময় এই সময়টা মানুষ যুদ্ধে যেতে পছন্দনীয় ছিল না তারপরেও রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেন এবং মক্কার বিভিন্ন গোত্র ও অধিবাসীগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যুদ্ধের যাত্রা করার জন্য। প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অভাব অনটনের কারণে মানুষের যুদ্ধে যেতে অনীহা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন । এ সময় আল্লাহ পাক যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সূরা তাওবার একটা অংশ অবতীর্ণ করেন। তার সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দান সদকা করার ফজিলত বর্ণনা করা হয় এবং আল্লাহর পথে আপন আপন উত্তম সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্র ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মদিনায় জড়ো হতে থাকে। যাদের অন্তরে মুনাফিকতা ছিল তারা বাদে সকলেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনজন সাহাবী নিষ্ঠাবান ঈমানদার হওয়া সত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এদের ব্যাপারটি আলাদা।

পক্ষান্তরে কিছু গরীব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে হাজির হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন কিন্তু যেহেতু অনেক দূরের রাস্তা তাই সাওয়ারি না থাকার কারণে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়নি।

- **তাবুকের পথে মুসলিম সেনাবাহিনী**

প্রায় ৩০ হাজার সেনা নিয়ে রসূলুল্লাহ(সা) তাবুকের পথে রওনা হন । ইতিপূর্বে এত বিশাল বাহিনী মুসলিমদের কখনোই ছিল না । এ বিশাল বাহিনীর রক্ষনাবেক্ষনের যথেষ্ট অভাব ছিল। খাদ্য ও যানবাহনের সমস্যা ছিল। ১৮ জনের প্রতি দলের জন্য একটি মাত্র উট বরাদ্দ করা হয়েছিল । অনেক সময় গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল । পথিমধ্যে তীব্র পানির সংকর দেখা দিল লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ(সা) এর নিকট তা জানালে তিনি পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করলেন এবং বৃষ্টি হয়ে গেল। ইসলামী সৈন্য তাবুক অবতরণ করে শিবির স্থাপন করলেন । তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করেন আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং তার রহমতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন । এই ভাষণের ফলে সৈন্যদলের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাবুক গোত্র সমূহের মধ্যে বিশাল ভয় ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে কারন তাদের ধারণা ছিল না এতটা পথ পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী তাবুক আক্রমণ করতে পারে। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তর ভাগে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে । আর এই সুবাদে মুসলিম বাহিনী সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যা হয়তো যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা মোটে সহজ কাজ ছিল না।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত গোত্র গুলির সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করে। যে সকল গোত্র এতদিন রোমানদের পক্ষ হয়ে কাজ করছিল তারা বুঝতে পারল যে পুরাতন ব্যবস্থার দিন শেষ হয়ে এসেছে তাই তারা নিজেদের স্বার্থে মুসলিমদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে গেল। এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাবুক গোত্র সমূহের মধ্যে বিশাল ভয় ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে কারন তাদের ধারণা ছিল না এতটা পথ পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী তাবুক আক্রমণ করতে পারে। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে

দেশের অভ্যন্তর ভাগে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে । আর এই সুবাদে মুসলিম বাহিনী সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে যা হয়তো যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা মোটে সহজ কাজ ছিল না।

- **মদিনায় প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা চেষ্টা**

কোন প্রকার সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিরাট বিজয় লাভ করে বিজয়ের বেশে মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধের ব্যাপারে মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় একটা গিরিপথের কাছে ১২ জন মুনাফিক নবী কারীম (সা) কে হত্যার একটা ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায় এবং তারা ব্যর্থ হয়। মুনাফিক দলটি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গী হুজাইফা (রা) তার ঢালের সাহায্যে মুনাফিকদের বাহন গুলোর উপর প্রবল ভাবে আঘাত করেন এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। সফর শেষে নবী করীম (সা) যখন দূর থেকে মদিনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন এই যে উহুদ পাহাড় যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালোবাসি । এদিকে মদিনায় রাসুলুল্লাহ (সা) এর আগমন সংবাদ পেয়ে মহিলা ও কিশোররা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে ও তার সাহাবীগণকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে থাকে । উক্ত যুদ্ধে যে সকল লোক অনুপস্থিত ছিল যারা ছিল অপারগ অথবা ছিল মুনাফিক । তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা প্রকৃত মুমিন ছিলেন এবং কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিলেন আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন। প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় প্রবেশের পর সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে অবস্থান করেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন অতঃপর লোকজনদের জন্য সেখানে বসে পড়েন।

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)- কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন, "হে মুয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে মুয়ায (রাঃ) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। অতঃপর যূল ক্বা'দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আসরের পূর্বে যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (রাযি.) বললেন, আজ রাতে আমার প্রভূর পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন, 'এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরাহ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নবী কারীম (সাঃ) ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নবী (সাঃ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে

তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ করে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচ্চ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কার নিকটবর্তী পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ (রাঃ) তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নবী কারীম (সাঃ) বললেন,

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন। যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নবী কারীম (সাঃ) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামিরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নবী (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিল এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

"ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা। তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল। হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা

তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে। আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভূর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ক আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

(اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ)

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।

নবী কারীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহকে রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন। রাসূলে কারীম (সাঃ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।' [আল-মায়িদাহ (৫) : ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই উমার (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন দ্বীনের বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করলো সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।

নবী কারীম (সাঃ)-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারও ইকামত করলেন। এ দু' সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্বাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তুপ) সামনে করলেন এবং ক্বিবলাহমুখী হয়ে নবী কারীম (সাঃ) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেলে এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নবী কারীম (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে

অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। নবী কারীম (সাঃ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নবী কারীম (সাঃ) বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে একশতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নবী কারীম (সাঃ)-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আলী (রাঃ) এ গোশত খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

‘বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল।

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। অদ্যকার ভাষণে নবী কারীম (সাঃ) গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

'আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা'দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।'

অতঃপর নবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) ভাল জানেন।' এ প্রেক্ষিতে নবী কারীম (সাঃ) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?' আমরা বললাম, 'তা কেন হবে না'? এর পর নবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'এ শহরটি কোন শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' নবী কারীম (সাঃ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ শহর কি মক্কা নয়'? আমরা বললাম তা কেন হবে না'? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নবী কারীম (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন দিবস'? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন'। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়'? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়'? আমরা বললাম অবশ্যই'। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন

পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভূর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আমি কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ, অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) বললেন,

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক' যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম (সাঃ) এ কথাও বলেছিলেন,

স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।

সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান

- **অসুস্থতার সূচনা**

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাকী'তে গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্ত সালাতে ইমামত করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, 'আমি আগামী কাল কোথায় থাকব, আমি আগামী কাল কোথায় থাকব?'

এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকতে পারবেন।'' বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নবী কারীম (সাঃ) স্থান পরিবর্তন করে আয়িশার গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফযল বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন আবূ ত্বালীবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নবী কারীম (সাঃ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আয়িশা (রাঃ) সূরাহ নাস ও ফালাক্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক মুখস্থকৃত দু'আ পড়ে নবী কারীম (সাঃ)-কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নবী কারীম (সাঃ)-এর হাত তাঁর পবিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, 'আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি

লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিকে পারি। এ প্রেক্ষিতে নবী কারীম (সাঃ)-কে একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে তাঁর উপর এত বেশী পরিমাণ পানি ঢালা হল যে, তিনি নিজেই 'ক্ষান্ত হও', ক্ষান্ত হও' বলতে থাকলেন।

সে সময় নবী কারীম (সাঃ)-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ (রাঃ) আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, 'ইয়াহুদ ও নাসারাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক এ কারণে যে, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

তিনি আরও বললেন,"তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন,

'আমি যদি কারো পিঠে কোড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।'

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। তারপর আবারও মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, 'আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নবী কারীম (সাঃ) ফযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, 'তাঁকে পরিশোধ করে দাও'। এরপর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

'আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের

প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সৎ লোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।’

‘এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করেছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এক জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।’ আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবূ বাকর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আশ্চর্য হলাম।

লোকেরা বলল, ‘এ বুড়োকে দেখ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, যে আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, বান্দাকে সে অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ‘স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবূ বাকর (রাঃ) এবং আমি যদি আপন প্রভূ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বাকর (রাঃ)-কে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবূ বাকর (রাঃ)-এর দরজা ছাড়া।

ওফাত প্রাপ্তির চার দিনে পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠিন রোগযন্ত্রণার সম্মুখীন হলেন তখন বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি

তোমাদের জন্য একটি নোট লিখে দেই যাতে তোমরা আমার পরে কোন দিনই পথভ্রষ্ট হবে না'।

ঐ সময় ঘরে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন উমার (রাঃ), তিনি বললেন, 'আপনার উপর রোগ যন্ত্রণার প্রাধান্য রয়েছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট'- এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, 'কাগজ কলম আনা হোক এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলবেন তা লিখে নেয়া হোক।' অন্যেরা উমার (রাঃ)-এর মত সমর্থন করলেন। লোকজনদের মধ্যে যখন এভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল তখন নবী কারীম (সাঃ) বললেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও'।

অতঃপর নবী কারীম (সাঃ) সে দিনটিতে উপদেশ প্রদান করলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে,'ইহুদী, নাসারা এবং মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিস্কার করবে। দ্বিতীয়টি হল, 'প্রতিনিধিদলের সে ভাবেই আপ্যায়ণ করবে যেমনটি (আমার আমলে) করা হতো।' তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত সেটি ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার উপদেশ, অথবা তা ছিল উসামা (রাঃ)-এর বাহিনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপদেশ, অথবা তা ছিল 'সালাত' এবং তোমাদের অধীনস্থ অর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ দিন (অর্থাৎ ওফাত প্রাপ্তির চার দিন পূর্বের বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সকল সালাতেই ইমামত করেন। এ দিবস মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন এবং সূরাহ 'ওয়াল মুরসালাতে উরফা' পাঠ করেন।

কিন্তু এশা সালাতের সময় অসুস্থতা এতই বৃদ্ধি পেল যে, মসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আর তাঁর রইল না। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'লোকজনেরা সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানি দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে

তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন।'

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একইরূপ করলেন, যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন, অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না।, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আবূ বাকর (রাঃ)-কে বলে পাঠালেন সালাতে ইমামত করার জন্য। এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ) ঐ দিনগুলোতে সালাতে ইমামত করেন। নবী কারীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবদ্দশায় আবূ বাকর (সাঃ)-এর ইমামতে সালাতে সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত।

আয়িশাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবূ বাকর (রাঃ)-এর পরিবর্তে অন্য কারো উপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট তিন কিংবা চারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এ অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন তাঁর পিতা সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণের কোন অবকাশ বা সুযোগ না পায়। কিন্তু নবী কারীম (সাঃ) প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে বললেন, 'তোমরা সকলেই ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গীসাথীদের মতোই হয়ে গিয়েছ। সালাতে ইমামতি করার জন্য আবূ বাকর (রাঃ)-কে নির্দেশ দাও।'

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাঃ)-কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে। শনিবার কিংবা রবিবারে নবী কারীম (সাঃ) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই, দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যুহর সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করেন। সেই সময় সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু 'আনহুম)-এর সালাতের জামাতে ইমামত করছিলেন আবূ বাকর (রাঃ)। তিনি নবী কারীম (সাঃ)-এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে ইশারায় পিছনে আসতে নিষেধ করে সামনেই থাকতে বললেন এবং নিজেকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্যকারীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন। এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ডান পাশে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর আবূ বাকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সালাতের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবীগণ

(রাযি.)-কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন। ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকটে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন।

- **পবিত্র জীবনের শেষদিন**

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নবী কারীম (সাঃ) আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) নিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন। আনাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নবী কারীম (সাঃ) সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নবী কারীম (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নবী কারীম (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাত্বিমাহ (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা শুনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। আয়িশা (রাঃ)-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাত্বিমাহ (রাঃ) বললেন যে, নবী কারীম (সাঃ) আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নবী কারীম (সাঃ)-এর

পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

ওই সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা দেখে ফাত্বিমাহ (রাঃ) কোন চিন্তা ভাবনা না করেই চিৎকার করে উঠলেন 'হায় আব্বাজানের কষ্ট! নবী কারীম (সাঃ) বললেন, আজকের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।

নবী কারীম (সাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহবান জানালেন এবং নসীহত করলেন। তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন,

'হে আয়িশা! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরা সমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে। তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরূপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত : (তিনি বললেন), আল্লাহর অভিসম্পাত ইয়াহূদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে। তাথেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখন্ডে আর কখনো এ দু'টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণ (রাঃ)-কে উপদেশ প্রদান করে বললেন,

অর্থ : সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)! এ শব্দগুলো নবী কারীম (সাঃ) বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

- **অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা**

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। আয়িশা (রাঃ) নবী কারীম (সাঃ)-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নবী কারীম (সাঃ) আমার ঘরে, আমার বিছানায়,

আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা'আলা আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আবূ বাকর (রাঃ) নবী কারীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নবী কারীম (সাঃ) মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্য করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাথা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নবী কারীম (সাঃ)-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি মিসওয়াক খানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু' হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমন্ডল মুছতে মুছতে বলছিলেন, 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত অথবা আঙ্গুল উত্তোলন করলেন এবং ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠল। আয়িশা (রাঃ) কান পেতে শ্রবণ করলেন, তিনি বলছিলেন,

'হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভূক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীকে আ'লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! রফীক্বে আ'লা।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নবী কারীম (সাঃ)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

- **সীমাহীন দুঃখ বেদনা**

হৃদয় বিদীর্ণকারী এ দুর্ঘটনার সংবাদ তৎক্ষনাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মদীনাবাসীগণের উপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। পৃথিবীর প্রান্ত এবং পার্শ্বস্থ সব

কিছুই যেন অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনা, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সে দিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখি নি এবং যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিনের মতো এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখি নি।

- **উমার (রা) এর অবস্থান**

নবী কারীম (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর হুশ বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক্ব মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মুসা বিন ইমরান (আঃ) গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে আবূ বাকর (রাঃ) সুনহ’তে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর লোকজনদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন। নবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। আবূ বাকর পবিত্র মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন,‘আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আল্লাহ আপনার উপর দু’বার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। সে সময় উমার (রাঃ) লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ) তাঁকে বললেন, ‘উমার বসো’। উমার (রাঃ) বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে

সাহাবীগণ (রাযি.) উমার (সাঃ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন,

'আল্লাহর প্রশস্তির পর, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূজা করেছিল তারা জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করেছিলে, অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল বিগত হয়ে গেছেন তাতে কি, তবে কি যদি নবী মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ামির ভরে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে, স্মরণ রেখো, যারা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেয়া হবে।' [আল 'ইমরান (৩) : ১৪৪]

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন আবূ বাকর (রাঃ)-এর এ ভাষণ শ্রবণের পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবূ বাকর (রাঃ) যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে ওয়াকেফহাল হলেন এবং সকলকেই এ আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাঃ) বলেছেন যে, 'উমার (রাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি যখন আবূ বাকর (রাঃ)-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিতবোধ করলাম। কারণ, আমি তখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, নবী কারীম (সাঃ) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

- **কাফন-দাফন**

নবী কারীম (সাঃ)-এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নবী কারীম (সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাকীফা বনু সায়েদার মধ্যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবূ বাকর (রাঃ)-এর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত নবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারক একটি জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা আবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস নবী কারীম (সাঃ)-কে কাপড়সহ গোসল দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহকে তিনবার কুল পাতার মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ বিন খায়সামাহ 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কূপের পানি পান করতেন।

গোসলের পর তিনটি কুরসুফ হতে তৈরী সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

নবী কারীম (সাঃ)-এর অন্তিমশয্যা সম্পর্কে সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, 'আমি নবী কারীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন নবীকে (পৃথিবী) থেকে উঠানো হয় নি তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা ব্যতীত যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

এরপর সাহাবীগণ (রাযি.) পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম নবী কারীম (সাঃ) পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে

অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন। সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাত্রে নবী কারীম (সাঃ)-এর দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।

শেষ কথা

অন্ধকার অরণ্যে এক ছটা আলোর কিরণ কিংবা ঘোর অমানিশায় উজ্জ্বল তারকার মত জন্ম যার। সততার অটল আদর্শে সদা হাস্যোজ্জ্বল তরুণ আলআমীন একদিন ওহীর পরশে সমগ্র জাতির কাছে হলেন রহমাতুল্লিল আলামিন। কখনও স্বজাতির প্রস্তরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শির, কখনও বদর-উহুদের রক্তে ভেজা জমিন মাড়িয়ে দ্বীনের ঝান্ডা বয়ে নিয়ে চলা। সন্তানের মৃত্যুতে ক্রন্দনরত পিতার হৃদয়, কখনও বা কিশোরী স্ত্রীর খেলার সাথী। যুগের পর যুগ ধরে লেখা হয়েছে হাজারো পৃষ্ঠা, কত শত ঘন্টা পেরিয়ে গেছে তার স্মৃতি রোমন্থনে। হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছুঁয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসা।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানুষটি রেখে গেছেন একটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সেই প্রজন্ম গড়েছে এক নতুন ইতিহাস। আল্লাহর রাসূল যেখানে শেষ করেছেন, সাহাবিরা সেখান থেকেই এক নতুন প্রজন্মের সূচনা করেছেন। সে যুগ ঈমানদীপ্ত জীবনের, সে যুগ গৌরবের। হাজার বছর পরও আজও লেখকের কলমের কালি ফুরিয়ে যায়নি, মিটে যায়নি নবীর প্রতি ভালোবাসার তৃষ্ণা। তার সম্পর্কে আরও একটু জানার আকাঙ্ক্ষায় আজও আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরি নতুন কোনো পান্ডুলিপি।

তিনিই আমাদের নবীজি।

সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিদের প্রতি।

তথ্যসূত্র

১. আর রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

২. সীরাহ্ - রেইনড্রপস মিডিয়া

৩. সীরাতে ইবনে হিশাম - মূলঃ ইবনে হিশাম (অনুবাদ - আকরাম ফারুক)

৪. মুখতাসার যাদুল মা'আদ - ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)

৫. https://www.hadithbd.com/

৬. https://bn.m.wikipedia.org

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111410773/